POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوْهُ ؕ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেন-দেন কর, তখন তোমরা উহা লিখিয়া লও।
(আল-বাকারা: ২৮৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 48
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 29 নভেম্বর , 2018 20 রবিউল আওয়াল 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! এই দুনিয়া চিরকাল থাকিবার জায়গা নহে। তোমরা সাবধান হও। সকল অনাচার পরিহার কর এবং সকল প্রকার মাদকদ্রব্য বর্জন কর। মানুষকে ধ্বংস করিবার জন্য শুধু সুরা পানই নহে, বরং আফিন, গাঁজা, চরস, ভাঙ, তাড়ি ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের মাদক দ্রব্য, যাহা সদা ব্যবহারের অভ্যাস করিয়া লওয়া হয়, মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এবং পরিণামে ধ্বংস করে। অতএব, তোমরা এইসব হইতে দূরে থাক।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পবিত্র হইতে চেষ্টা কর, কেননা মানুষ পবিত্র সত্তাকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে নিজে পবিত্র হয়, কিন্তু তোমরা কিরূপে এই নেয়ামত লাভ করিতে পার– স্বয়ং খোদাতা'লাই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কুরআন শরীফে বলিয়াছেনঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থাৎ "নামায ও আধ্যাবসায় সহকারে খোদাতা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর"।

নামায কি? ইহা হইল দোয়া, যাহা 'তসবীহ' (মহিমা কীর্তন) 'তাহমীদ'(প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), 'তকদীস' (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং 'ইস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া শক্তি প্রার্থনা) ও 'দরূদ' সহ (অর্থাৎ হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর আশিস কামনা করতঃ– অনুবাদক) সবিনয়ে প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকিও না। কারণ তাহাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র যাহাতে কোন সারবস্তু নাই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদাতা'লার কালাম কুরআন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর। নিবেদন জানাও যেন সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়।

বিপদকালে তোমাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিতে পাঁচটি পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে যাহা সংঘটিত হওয়া তোমাদের প্রকৃতির জন্য আবশ্যকীয়।

১। প্রথমে যখন তোমাদিগকে কোন আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অবগত করা হয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ– তোমাদের নামে যেন আদালত হইতে এক ওয়ারেন্ট গ্রেফতারী পরওয়ানা) জারী কার হইল; তোমাদের শান্তি ও সুখে ব্যাঘাত ঘটাইবার ইহা প্রথম অবস্থা। বস্তুতঃ এই অবস্থা অবনতির অবস্থার সহিত তুলনীয়; কেননা ইহাতে তোমাদের সুখের অবস্থার পতন আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যোহরের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে, যাহার ওয়াক্ত সূর্যের নিম্নগতি হইতে আরম্ভ হয়।

২। দ্বিতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন তোমরা বিপদের অতি সন্নিকট হও। দৃষ্টান্ত স্বরূপ– যখন তোমরা ওয়ারেন্ট দ্বারা গ্রেফ্‌তার হইয়া হাকিমের সমীপে উপস্থিত হও। এই অবস্থায় ভয়ে তোমাদের রক্ত শুষ্ক হইতে থাকে এবং শান্তির আলো তোমাদের নিকট হইতে বিদায় হওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং আমাদের এই অবস্থা সেই সময়ের সদৃশ। যখন সূর্যের আলো ক্ষীণ হইয়া আসে ও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় এবং স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, এখন সূর্য অস্তমিত হইবার সময় সন্নিকট। এইরূপ আত্মিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসরের নামাযের সময় নির্ধারিত করা হইয়াছে।

৩। তৃতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন এই বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, অর্থাৎ তখন যেন তোমাদের নামে চার্জশিট (দোষী সাবস্ত করে লিখিত পত্র) লিখিত হয় এবং তোমাদের বিনাশের জন্য বিরুদ্ধবাদীগণের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। এই অবস্থায় তোমাদের জ্ঞান লোপ পায় এবং তোমরা নিজদিগকে কয়েদী জ্ঞান করিতে থাক। সুতরাং এই অবস্থা সেই সময়ের সদৃশ যখন সূর্য অস্তমিত হয় এবং দিবালোকের সকল আশার অবসান হয়। এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া মাগরিবের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

৪। চতুর্থ পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে যখন বিপদ বস্তুতই তোমাদের উপর পতিত হয় এবং ইহার ঘন অন্ধকার তোমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে; যথা চার্জশিট অনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণের পর শাস্তির আদেশ তোমাদিগকে শুনানো হয় এবং কারাদন্ডের জন্য কোন পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়। এই অবস্থা সেই সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখে যখন রাত্রি আরম্ভ হয় এবং গভীর অন্ধকার ছাইয়া যায়। এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এশার নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

৫। অতঃপর যখন তোমরা এক দীর্ঘকাল এই বিপদের অন্ধকারে অতিবাহিত কর, তখন পুনরায় তোমাদের প্রতি খোদাতা'লার করুণা উদ্বেলিত হয় এবং তোমাদিগকে এই অন্ধকার হইতে মুক্তি দান করে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন অন্ধকারের পর প্রাতঃকাল দেখা দেয় এবং দিনের সেই আলো আবার আপন উজ্জলতার সহিত প্রকাশিত হয়। অতএব এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ফজরের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

খোদাতা'লা তোমাদের প্রক"তিগত পরিবর্তনের পাঁচটি অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই তোমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্তের নামায নির্ধারিত করিয়াছেন। ইহা হইতেই তোমরা উপলব্ধি করিতে পার যে, এই সকল নামায কেবল তোমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। সুতরাং যদি তোমরা এইসকল বিপদ হইতে বাঁচিতে

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

খিলাফত রূপী আশির্বাদ ইসলামের প্রথম যুগে সেই সময় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল যখন জাগতিকতা বেশি মাত্রায় প্রাধান্য পেয়েছিল। এখন ইনশাআল্লাহ্ এই কল্যাণ আল্লাহ্ তা'লা অব্যাহত রাখবেন, কিন্তু এর থেকে সেই সমস্ত মানুষ বঞ্চিত হবে যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার পূর্ণ করবে না

২০১৮ সালের ১২, ১৩ ও ১৪ অক্টোবর তারিখে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র বাৎসরিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারতের প্রিয় সদস্যবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ ওয়া বরকাতুহু

আলহামদোলিল্লাহ্ আপনারা এবছরও বাৎসরিক ইজতেমা আয়োজন করার তৌফিক পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা এর আয়োজনকে সার্বিকভাবে আশিসমণ্ডিত করুন এবং এর থেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আল্লাহ্ তা'লার এটি মহান অনুগ্রহ যে, আপনারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার তৌফিক লাভ করেছেন। তিনি স্বীয় জামাতকে নিজের মৃত্যুর দুঃখজনক সংবাদের সঙ্গে এই সুসংবাদও দিয়েছিলেন-

" যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমণ তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না" (আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৫)

তাই আপনাদেরকে অভিনন্দন, আপনারা খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এটি এমন এক বরকত মণ্ডিত ব্যবস্থাপনা যেটি ভিন্ন ধর্মীয় উন্নতি সম্ভব নয়। এটি ছাড়া জামাতের ঐক্য ও সংহতিও অক্ষুন্ন থাকতে পারে না। খিলাফতের কল্যাণই সমগ্র জগতে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা পৌঁছে যাচ্ছে। এম.টি.এর মাধ্যমে যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক সতত দৃঢ়তর হচ্ছে এবং সার্বিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। খিলাফত রূপী আশির্বাদ ইসলামের প্রথম যুগে সেই সময় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল যখন জাগতিকতা বেশি মাত্রায় প্রাধান্য পেয়েছিল। এখন ইনশাআল্লাহ্ এই কল্যাণ আল্লাহ্ তা'লা অব্যাহত রাখবেন, কিন্তু এর থেকে সেই সমস্ত মানুষ বঞ্চিত হবে যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার পূর্ণ করবে না এবং সেই সমস্ত শর্ত পালন করে যা খিলাফতের আশীর্বাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা প্রযুক্ত রেখেছেন। অতএব এই নিয়ামতের কদর করুন এবং নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে খিলাফতের গুরুত্ব এবং কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করতে থাকুন। আল্লাহ্ করুক আমরা আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় অনুসারে খিলাফতরূপী আশীর্বাদকে সযত্নে ধরে রাখতে পারি।

একথাও স্মরণ রাখবেন যে, খিলাফতের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানকারী হবে আর এর প্রথম অধিকার হল 'ইয়াবুদুনানি' অর্থাৎ তারা আমার ইবাদত করবে। অতএব এই নিয়ামত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে হলে নিজেদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায সুনিশ্চিত করুন। কুরআন করীম এটিকে এমন আবশ্যিক ইবাদত আখ্যায়িত করেছে যা যথাসময়ে পালনীয়। হাদীসেও নামাযের বিষয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একবার আঁ হযরত (সা.) একটি উপমা দ্বারা নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- তোমরা কি মনে কর যে, কারো গৃহের পার্শ্বদেশ দিয়ে কোন নহর প্রবাহিত হয় আর সেই নহরে সে প্রত্যহ পাঁচ বার স্নান করে, তবে তার দেহে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবারা নিবেদন করেন- হে রসুলুল্লাহ! নিশ্চয় কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিষয়টিও অনুরূপ। আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে পাপ ক্ষমা করেন এবং দূর্বলতা বিদূরীত করেন। (সহী বুখারী, কিতাব মোয়াকিতুস সালাত)

মসজিদ নামাযি দ্বারা পরিপূর্ণ করার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। ইসলাম পুরুষদেরকে বা-জামাত নামাযের নির্দেশ দিয়েছে। এর মাধ্যমে ঐক্য সৃষ্টি হয়। একটি হাদীসে বা-জামাত নামাযের জন্য একা নামায পড়া অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি পুণ্য নির্ধারিত আছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন মোমিনকে নামাযের প্রতি এমন নিয়মনিষ্ঠ হওয়া উচিত যাতে এক্ষেত্রে কখনও কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শিত না হয়। মানুষ যখন নিরবিচ্ছিন্নভাবে নামায পড়ে তখন সে নামাযে এক প্রকার আনন্দের আস্বাদ দান করা হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: "নামাযের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ হও এবং তওবা ও ইসতেগফারে রত হও। মানুষের অধিকার রক্ষা কর এবং কাউকে দুঃখ দিও না। সত্য এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতি কর, আল্লাহ্ সকল প্রকার কৃপা করবেন। পরিবারের মহিলাদেরকেও নামাযের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ হওয়ার উপদেশ কর।" (মালফুাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৪)

অতএব নিজেও নামাযের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ হন এবং পরিবারের সদস্যদেরকেও এর উপদেশ করতে থাকুন।

এছাড়াও আনসারুল্লাহ্‌র একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সন্তানের তরবীয়ত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর প্রিয় শিষ্যদের উদ্দেশ্যে সন্তানদের ধর্মের সেবক বানানো, তরবীয়তের বিষয়ে পরিকল্পনা করা এবং বিশ্বাসগত ও চারিত্রিক সংশোধনের বিষয়ে উপদেশ দান করেছেন। তিনি চাইতেন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতা উভয়ে যেন পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রতি মনোযোগী হয়।

একটি বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এক আহমদী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে পত্র মারফত অবহিত করে যে, তার এক তবলীগাধীন বন্ধুর তিনজন স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু কোন সন্তান নেই। সে (সেই বন্ধু) এই শর্তে বয়াত করতে আগ্রহী হয়েছে যে, হুযুরের দোয়ার কল্যাণে তার প্রথমা স্ত্রী থেকে যেন পুত্র সন্তান লাভ হয়। চিঠির উত্তরে তাকে জানানো হয় যে, হুযুর দোয়া করেছেন যে, পুত্র সন্তান লাভ হবে, কিন্তু শর্ত হল যাকারিয়ার মত তওবা করতে হবে। এরপর সেই ব্যক্তি বিধর্মীদের ন্যায় জীবনযাপন করা ত্যাগ করে দেয়। এছাড়াও মদ্যপান ও উৎকোচ গ্রহণ ত্যাগ করে নামাযের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ তা'লা হুযুরের দোয়ার কল্যাণে তাকে পুত্র সন্তান দান করেন। সন্তান লাভের পাশাপাশি উক্ত অঞ্চলে সে আরও অনেক মানুষকে বয়আত করানোর সৌভাগ্য অর্জন করে।

(খুলাসা রেওয়াত নম্বর- ২৪১, সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড)

অতএব পিতা-মাতার দ্বারা পুণ্যের উৎকৃষ্ট নমুনা প্রদর্শিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যের ফল দান করেন। সত্যবাদী এবং সত্যান্বেষীদের সন্তানদেরকেও তাদের পুণ্যের প্রতিদান দেওয়াই তাঁর রীতি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" সেই কাজ কর যা সন্তানের জন্য উৎকৃষ্ট নমুনা এবং শিক্ষনীয় বিষয় হবে। এর জন্য সর্বপ্রথম নিজের সংশোধন করা আবশ্যক। যদি তুমি উচ্চ মানের মুত্তাকি ও পারহেযগার হয়ে যাও এবং খোদা তালাকে সন্তুষ্ট করে নাও, তবে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমার সন্তানেরও মঙ্গল করবেন। কুরআন করীমে খিযর এবং হযরত মূসা আলাইহিমুস সালামের ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ওয়া কানা আবুহুমা সালেহা' অর্থাৎ তাদের দুজনের পিতা পুণ্যবান ছিলেন। একথার উল্লেখ করে নি যে, তারা কেমন ছিলেন। অতএব এই উদ্দেশ্য অর্জন কর। সন্তানের জন্য সর্বদা পুণ্যের বাসনা কর।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৪৪-৪৪৫)

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এই সকল উপদেশাবলী মান্য করার তৌফিক দান করুন এবং স্বীয় কৃপা দানে ধন্য করুন। আমীন

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

****

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রকৃত আহমদী হওয়ার কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন এবং কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আর কিছু অবশ্য পালনীয় কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন, যদি এগুলো মেনে চল, এগুলো পালন কর, কেবল তবেই সত্যিকার অর্থে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হবে।

মহানবী (সা.) বলেছেন, কোন কাজ করতে গিয়ে লোক দেখানো আর গুপ্ত কামনা বাসনার দাসত্ব করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যক্তি যদি ধর্মীয় আদেশাবলীকে অবজ্ঞা করে জাগতিক কামনা বাসনার দাসত্ব করে তাহলে সে শিরক করে খিলাফতের প্রধান দায়িত্বই হলো শির্ককে নির্মূল করা এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা আর সেই মিশনকে পরিপূর্ণতা দেওয়া, যার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রেরিত হয়েছেন।

খেলাফতের সম্মান প্রতিষ্ঠা করা খলীফায়ে ওয়াক্তের দায়িত্ব। এটি তার কাজ আর এটি তিনি করবেন। আর তা এজন্য করবেন যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খিলাফতের মাধ্যমে পৃথিবীতে তৌহিদের বাণী বিস্তার লাভ করবে এবং পৃথিবী থেকে শির্ক নির্মূল হবে।

একত্ববাদী হওয়ার দাবি যদি থাকে, আল্লাহ্‌র ইবাদত করার যদি দাবি থেকে থাকে, যদি সত্যিকার মুসলমান হওয়ার দাবি করে থাক তাহলে নিজেদের মাঝ থেকে মিথ্যাকেও আর মিথ্যাবাদীকেও বের করতে হবে। অনেকেই তুচ্ছ বিষয়ে মিথ্যা বলে বসে, এটি একজন মু'মিনের জন্য শোভনীয় নয়।

আমাদের কর্ম যদি আমাদের শিক্ষা সম্মত হয়, কেবল তবেই আমাদের তবলীগও ফলপ্রসু হবে আর মানুষের ওপর আমাদের ভালো প্রভাব পড়বে।

কুরআন করীমের আয়াত, আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে বয়আতের তাৎপর্য, যুগ খলীফার সম্মান, খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্কের গুরুত্ব, তৌহিদ প্রতিষ্ঠা, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত-বিশেষ করে বা-জামাত নামাযের আদেশ শিরোধার্য করা, ইসতেগফার, হুকুকুল ইবাদ পূর্ণ করা, মানসম্মত আর্থিক কুরবানী এবং 'মারুফ' বিষয়ে আনুগত্য করার প্রকৃত তাৎপর্যের বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বর্ণনা এবং শিরক, মিথ্যা, ব্যাভিচার এবং যাবতীয় প্রকারের জুলুম, অহংকার এবং গর্ব থেকে বিরত থাকার উপদেশ।

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ডে বাইতুর রহমান মসজিদে প্রদত্ত ২রা নভেম্বর, ২০১৮, এর জুমআর খুতবা (২ নবুয়ত, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তি সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, যে আহমদী হওয়ার দাবি করে, তার কেবল এই ঘোষণাই প্রকৃত আহমদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যে, সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মানে, তাঁর দাবিতে বিশ্বাস রাখে। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রকৃত আহমদী হওয়ার কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন এবং কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আর কিছু অবশ্য পালনীয় কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন, যদি এগুলো মেনে চল, এগুলো পালন কর, কেবল তবেই সত্যিকার অর্থে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হবে। এক কথায় আহমদী হওয়ার জন্য শুধু বিশ্বাসগত পরিবর্তন যথেষ্ট নয় বা কেবল এটিকেই যথেষ্ট মনে করো না যে, আমার পিতামাতা আহমদী ছিলেন, তাই আমিও আহমদী বা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবিকে সত্য হিসেবে মেনেছি, তাই আমি আহমদী। বিশ্বাসগতভাবে এটি এক ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে আহমদী সাব্যস্ত করে কিন্তু কার্যত আহমদী হওয়ার জন্য নিজের সকল শক্তিসামর্থ্য এবং যোগ্যতা দিয়ে সেসব কথাকে কাজে রূপ দেওয়া আবশ্যক যার প্রত্যাশা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক আহমদীর কাছে করেছেন। তিনি অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় বলেছেন যে, যদি নিজের সকল শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করে এই কথাগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা না কর, তাহলে তোমার দাবি নিছক বুলিসর্বস্ব, কেবলই মৌখিক দাবি। তিনি বলেন,

"বয়আতের অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র হাতে প্রাণ সোপর্দ করা, যার অর্থ হলোআমরা আজকে আমাদের প্রাণ খোদার হাতে বিক্রি করে দিয়েছি।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব, এটি সামান্য কোন কাজ নয়। আমরা যখন কারো কাছে কিছু বিক্রি করি তখন তার ওপর আমাদের আর কোন অধিকার থাকে না বরং যার কাছে বিক্রি করি, সে-ই সেই জিনিসের প্রকৃত মালিক বা অধিকারী হয়ে যায় আর নিজের ইচ্ছানুসারে সে সেটি ব্যবহার করে। অতএব, এটি হলো সেই অবস্থা যা আমাদের নিজেদের জীবনে আনয়ন এবং বাস্তাবায়ন করতে হবে। এটি সেই চিন্তা-চেতনা যা আমাদের জীবন সম্পর্কে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। এই চেতনা এবং এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য তিনি বলেন-

"বয়আতকারীকে সর্বপ্রথম বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করতে হয় আর অহংকার এবং আত্মম্ভরিতার সাথে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়।" এই হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শব্দ যে, নিজের অহমিকা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। অনেকের মাঝে অহংকারের যে চিত্র রয়েছে তা দেখুন- এক জায়গায় আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও এক কর্মকর্তা অন্য কর্মকর্তার সাথে রাগ করে নামাযের জন্য মসজিদে আসে নি, আর তা এই কারণে যে, সেই ওহদাদারের সাথে তার সম্পর্ক ভালো নয়। তার অহংকার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, খিলাফতের হাতে বয়আতের দাবি থাকা সত্ত্বেও সেই দাবির প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ তার মাঝে নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যদি বয়আত করে থাক, তাহলে অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা পরিহার করতে হবে। তিনি বলেন, "কেবল তখনই তার ক্রমবিকাশের যোগ্যতা অর্জন করে, কিন্তু বয়আত করার পর যদি অহমিকাকেও লালন করে, তাহলে সেই কল্যাণরাজি আদৌ লাভ হয় না।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৭৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ) মৌখিক দাবি তো রয়েছেই। সাক্ষাতের সময় অত্যন্ত সম্মানের সাথে সাক্ষাতও করবে কিন্তু পারস্পরিক মনোমালিন্যের কারণে এই কথার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না যে, সেখানে খলীফায়ে ওয়াক্ত উপস্থিত আছেন আর তাঁর পিছনে নামায পড়তে যেতে হবে, কোন পদাধিকারীর জন্য তো আমি মসজিদে যাচ্ছি না। অথচ নিজেও একজন পদাধিকারী। অবস্থা যদি এমনই হয়, তাহলে এমন মানুষের আহমদী হয়ে কী লাভ? অতএব প্রাণ বিক্রি করার অর্থ হলো বিনয় এবং নম্রতা থাকতে হবে, আমিত্বকে পদপিষ্ট করতে হবে, অহংকার এবং অহমিকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। মানুষের নিজের যেন আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে আর সবকিছু যেন খোদার নির্দেশের অধীনস্ত হয়। এই অবস্থা যদি সিদ্ধ হয়, তাহলে এমন নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা সেই প্রাণকে বিনষ্ট করবেন। খোদার হাতে নিজের প্রাণ যখন সোপর্দ করেছেন, এমন প্রাণ এবং এমন জীবনকে আল্লাহ্ তা'লা মূল্য দিয়ে থাকেন। আর সকল অর্থে এর সুরক্ষা করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"বয়আতের সময় কৃত অঙ্গীকার ও অতঃপর কর্ম বা আমল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাহলে দেখ এটি কত বড় পার্থক্য"। কত বড় স্ববিরোধ তোমাদের কথার মাঝে বিদ্যমান। "খোদার সাথে যদি কোন পার্থক্য রাখ তাহলে তিনিও পার্থক্য রাখবেন।"

(মালফুযাত, ৪র্থখণ্ড, পৃ: ৭০-৭১, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি বলেন, "তাই তোমরা তোমাদের ঈমান এবং কর্মের বিশ্লেষণ করে দেখ যে, এমন পরিবর্তন এবং পরিচ্ছন্নতা আনয়ন করেছ কি যে, তোমাদের হৃদয় খোদার 'আরশ' (বিকাশ স্থল) হয়ে যাবে আর তোমরা তাঁর নিরাপত্তার ছায়ায় এসে যাবে।"

(মালফুযাত, ৪র্থখণ্ড, পৃ: ৭০, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি (আ.) বলেন, "আমি বার বার আমার জামা'তকে বলেছি যে, তোমরা নিছক এ বয়আতের ওপর ভরসা করবে না, যতক্ষণ এর বাস্তবতা বা মজ্জা পর্যন্ত না পৌঁছবে ততক্ষণ মুক্তি নেই।"

(মালফুযাত, ৪র্থখণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি (আ.) বলেন, আমি তোমাদের বারংবার নসিহত করছি যে, এমনভাবে পুতঃ পবিত্র হয়ে যাও যেভাবে সাহাবীরা নিজেদের জীবনে পরিবর্তন এনেছেন।"

(মালফুযাত, ৪র্থখণ্ড, পৃ: ৭০, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

সাহাবীদের দেখুন! নিজেদের জীবনে কি মহান পরিবর্তন তারা এনেছেন। বহু বছরের শত্রুতা বরং প্রজন্ম পরম্পরায় যে শত্রুতা তাদের ছিল, খোদার ভালোবাসার খাতিরে তারা সেটিকে প্রেমপ্রীতি এবং ভালোবাসায় পরিবর্তিত করেছেন আর কোথায় দেখুন, কয়েক মুহূর্তের মনোমালিন্যের কারণে মসজিদে আসা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। নিজেদের প্রাণ বিক্রি করে অর্থাৎ বয়আতের পর যারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ ছিল তারা সুশিক্ষিত হয় আর সুশিক্ষিত মানুষ থেকে তারা খোদাপ্রেমিক মানুষে পরিবর্তিত হয়েছেন। তারা কায়োমনোবাক্যে একথা বিশ্বাস করেছেন যে, আমাদের নিজেদের কোন কিছুই আজ থেকে আমাদের নিজের নয়, বরং সব কিছু খোদা তা'লার। শির্ক বা বহুশ্বরবাদ থেকে তারা যখন তওবা করেছেন এরপর সবচেয়ে গুপ্ত ও অপ্রকাশিত শির্কও বর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। গুপ্ত বা অপ্রকাশিত শির্ক কী? এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মহীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"শিরক বলতে কেবল পাথর ইত্যাদির পূজা করাকেই বোঝায় না, বরং উপকরণের পূজাও শিরক আর জাগতিক বিভিন্ন উপাস্যের পিছনে ছুটাও শির্ক। "

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮-১৯, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

জাগতিক উপাস্য বলতে কী বুঝায়? জাগতিক স্বার্থ, যার খাতিরে মানুষ ধর্মের বিধি-নিষেধ আর খোদা তা'লার শিক্ষামালাকে অবজ্ঞা করে, বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখায়। মহানবী (সা.) বলেছেন, কোন কাজ করতে গিয়ে লোক দেখানো আর গুপ্ত কামনা বাসনার দাসত্ব করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

(মুসতাদরিক লিল হাকিম, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৩৬৬, কিতাবুর রিকাক, হাদীস: ৭৯৪০)

কোন ব্যক্তি যদি ধর্মীয় আদেশাবলীকে অবজ্ঞা করে জাগতিক কামনা বাসনার দাসত্ব করে তাহলে সে শিরক করে অর্থাৎ খোদার সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায়। সাহাবীদের মাঝে এতবেশি খোদাভীতি ছিল যে, এক সাহাবী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একবার বসে কাঁদছিলেন। কেউ কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর এই কথা আমার মনে পড়ছে যে, তিনি (সা.) বলেছেন, আমি আমার উম্মত সম্পর্কে শিরক এবং সুপ্ত কামনা-বাসনার বিষয়ে আশঙ্কা করছি।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৮৩৫)

এই ছিল সাহাবীদের মাঝে খোদাভীতির প্রকৃত চেতনা এবং শিরক থেকে মুক্ত থাকার প্রেরণা। বরং অন্যদের জন্যও তাদের মাঝে এক উৎকণ্ঠা ছিল, এক চেতনা ছিল যে, উম্মতে এমন মানুষেরও জন্ম হবে যারা গুপ্ত এবং অপ্রকাশিত শিরকে লিপ্ত থাকবে। তার হৃদয়ে এই ধারণার উদ্রেক হয় আর তাতেই তাঁর শরীর শিউরে উঠে, চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ক্রন্দন আরম্ভ করেন। এমন অবস্থার সৃষ্টি হলেই মানুষ সত্যিকার অর্থে একত্ববাদী এবং এক খোদার ইবাদতকারী হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

" শুধু মুখে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা এবং হৃদয়ে সহস্র সহস্র প্রতিমা জমা করিবার নাম তৌহীদ নয়। বরং যে ব্যক্তি তাহার নিজ কাজ, ফন্দি, ধোকাবাজি বা চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে খোদার ন্যায় প্রাধান্য দেয়, কিংবা কোন মানুষের উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাকে, যাহা খোদার উপর দেওয়া উচিত, সে খোদা তা'লার নিকট পৌত্তলিক। " তিনি বলেন, " প্রত্যেক জিনিস বা কথা বা কাজ যাহাকে এরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাহা খোদা তা'লার হক, উহা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রতিমা।" তিনি বলেন, " স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত তৌহীদ, যাহার স্বীকারুক্তি খোদা আমাদের নিকট চান এবং যাহার সহিত নাজাতের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা এই যে, খোদা তা'লাকে মুর্তি, মানুষ, সূর্য, চন্দ্র, নিজাত্মা, প্রবৃত্তি, কিংবা আপন চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ফন্দিফিকির ইত্যাদি সকল প্রকার বস্তুর অংশীবাদিতা হইতে পবিত্র জ্ঞান করা। তাঁহার মোকাবোয় কাউকে শক্তিশালী জ্ঞান না করা। কাহাকেও অন্নদাতা স্বীকার না করা, কাহাকেও সম্মানদাতা বা লাঞ্ছনাকারী ধারণা না করা এবং কাহাকেও সাহায্যকারী নির্ধারণ না করা।"

(সীরাজুদ্দিন খ্রীষ্টানের চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৪৯-৩৫০)

এ কথা মনে করা যে, এদের সাথে আমার সম্মান এবং অসম্মানের সম্পর্ক, এটিই শির্ক। এই সমস্ত বিষয়ের জন্য কেবল খোদা তা'লার ওপরই নির্ভর করা উচিত। অতএব, এ বিষয়গুলোই হলো ইসলামের মৌলিক শর্ত, যা আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের জন্য প্রাথমিক শর্ত।

কেউ আমাকে বলে যে, মানুষ খিলাফত বা খলীফায়ে ওয়াক্তকে এতটা বড় মর্যাদা দিয়ে থাকে যে, তারা প্রায় শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। স্পষ্ট থাকে যে, রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর দাসত্বে মসীহ্ মওউদ (আ.) পৃথিবী থেকে শিরককে নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করার জন্য এসেছিলেন। তাই এটি কোনভাবেই সম্ভব নয় যে, তাঁর সত্য এবং প্রকৃত খিলাফত কোন প্রকার শিরকের প্রসার করবে বা শির্ককে উৎসাহিত করবে। খিলাফতের প্রধান দায়িত্বই হলো শির্ককে নির্মূল করা এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা আর সেই মিশনকে পরিপূর্ণতা দেওয়া, যার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রেরিত হয়েছেন। কোন ব্যক্তির খলীফায়ে ওয়াক্তকে সম্মান করার রীতি এবং পদ্ধতি দেখে কেউ যদি এই কথা মনে করে থাকে তাহলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে তার চিন্তা করা উচিত যে, সে কু-ধারণা পোষণ করছে না তো? যদি কুধারণা পোষণ করে থাকে তাহলে কুধারণা পোষণকারীদের কুধারণা থেকে বিরত থাকা উচিত। কোন ব্যক্তি সত্যিই যদি এতটা সীমা ছাড়িয়ে যায় যেখানে মানুষের মাঝে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, নাঊযুবিল্লাহ্, খলীফায়ে ওয়াক্তকে এমন মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে যা শিরকের নামান্তর, তাহলে এমন ব্যক্তির ইস্তেগফার করা উচিত আর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আমি নিজেও এটিকে পছন্দ করি না আর না কখনো করেছি। আর আমার পূর্বের কোন খলীফাও এমনটি পছন্দ করেন নি আর ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে আগত খলীফারাও এটিকে কখনো পছন্দ করবেন না যে, তাদের সত্তাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে। হ্যাঁ, খেলাফতের সম্মান প্রতিষ্ঠা করা খলীফায়ে ওয়াক্তের দায়িত্ব। এটি তার কাজ আর এটি তিনি করবেন। আর তা এজন্য করবেন যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খিলাফতের মাধ্যমে পৃথিবীতে তৌহিদের বাণী বিস্তার লাভ করবে এবং পৃথিবী থেকে শির্ক নির্মূল হবে। অতএব, কিছু অপরিপক্ক মাথায় তরবিয়তের অভাবে এই যে ধ্যানধারণার উৎপত্তি হয়। এমন লোকদের মাথা থেকে এমন ধ্যানধারণা বের করে দেওয়া উচিত। তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আর নিজ মান্যকারীদের হৃদয়কে শিরক থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার গুরুদায়িত্ব পালনের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দৃষ্টি যেদিকে আকর্ষণ করেছেন আর যার ভিত্তিতে তিনি আমাদের কাছ থেকে বয়আত নিয়েছেন তা হলো- মিথ্যা এবং নৈতিক ব্যাধি থেকে পবিত্র থাকা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (সূরা আল্ হাজ্জ: ৩১)। অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক। এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

" মিথ্যাকেও কুরআন করীম একটি অপবিত্রতা এবং নোংরা বিষয় আখ্যায়িত করেছে।" তিনি বলেন, "দেখ! এখানে অর্থাৎ এই আয়াতে মিথ্যাকে প্রতিমার সমান্তরালে রাখা হয়েছে, সত্যিকার অর্থে মিথ্যা এক প্রতিমাই হয়ে থাকে। নতুবা কেন সত্যকে বাদ দিয়ে অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়? প্রতিমার মাঝে যেভাবে কোন বাস্তবতা নেই, একইভাবে মিথ্যাতে প্রতারণা ও ধোঁকা ছাড়া আর কিছু থাকে না।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫০, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

মিথ্যার পিছনে থাকে এক কৃত্রিমতা, বাহ্যিক কিছু শব্দকে sugar-coat করে উপস্থাপন করা বা কোন রচনা থাকলে সেটিকে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয় আর অভ্যন্তরীণভাবে তা হয়ে থাকে অন্তঃসারশূণ্য। তিনি আরো বলেন, "মিথ্যাও একটি প্রতিমা, যার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরতাকে পরিহার করে আর মিথ্যা বললে আল্লাহ্‌র সাথেও আর কোন সম্পর্ক থাকে না।" (ইসলামী ওসূল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১০, পৃ: ৩৬১)

অতএব, একত্ববাদী হওয়ার দাবি যদি থাকে, আল্লাহ্‌র ইবাদত করার যদি দাবি থেকে থাকে, যদি সত্যিকার মুসলমান হওয়ার দাবি করে থাক তাহলে নিজেদের মাঝ থেকে মিথ্যাকেও আর মিথ্যাবাদীকেও বের করতে হবে। অনেকেই তুচ্ছ বিষয়ে মিথ্যা বলে বসে, এটি একজন মু'মিনের জন্য শোভনীয় নয়। এটি মনে করা উচিত নয় যে, ছোট ছোট মিথ্যা কথা মিথ্যা নয়। এগুলো অবশ্যই মিথ্যা আর তৌহিদ বা একত্ববাদ থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায়। পারস্পরিক অনেক বিষয়াদি রয়েছে, ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে, এমন বিষয়াদি রয়েছে, যে ক্ষেত্রে মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের স্বার্থের অনুকূলে কোন সিদ্ধান্ত দাঁড় করায়। কত সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে রসূলে করীম (সা.) মিথ্যা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। মানুষ যদি এ সম্পর্কে ভাবে তাহলে তার শরীর শিউরে উঠে। তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন শিশুকে বলে যে, আস, আমি তোমাকে কিছু দেব আর এরপর যদি সে না দেয় তাহলে এটি মিথ্যা বলে গণ্য হবে। (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল আদাব)

হাসিঠাট্টার ছলেও যদি মিথ্যা বলা হয় সেটিও মিথ্যাই হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, মিথ্যা পাপ এবং (ফিসক ও ফুজুর) অনাচার-কদাচারের দিকে নিয়ে যায় আর অনাচার-কদাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। 'ফিস্‌ক ও ফুজুর'- এর অর্থ হলো সত্য থেকে যে বহু দূরে অবস্থানকারী এবং ভয়াবহ পাপী ও দুষ্কৃতিকারী। তাই প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণ আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, সত্যের কোন মানে আমরা রয়েছি, আমরা কি সত্যের সেই উন্নতমানে অধিষ্ঠিত আছি যা মহানবী (সা.) উল্লেখ করেছেন? যা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এই সত্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল আদাব)

আরেকটি পাপের কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁর মান্যকারীদেরকে এটি থেকে দূরে থাকার নসীহত করেছেন বরং এটি বয়আতের শর্তাবলীরও অন্তর্ভুক্ত আর তা হলো ব্যাভিচার। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৩)

ব্যাভিচার বলতে কেবল বাহ্যিক ব্যভিচার বুঝায় না অর্থাৎ কেবল অবৈধ সম্পর্কের নামই ব্যাভিচার নয় বরং, তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যে বলেন, 'ওয়ালা তাকরাবুয যিনা' (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৩) অর্থাৎ ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ এমন অনুষ্ঠানাদি থেকে দূরে থাক যে কারণে হৃদয়ে এমন ধারণা প্রশ্রয় পেতে পারে।" কার্যতই নয়, বরং হৃদয়ে সেই ধারণার উদ্রেকও ঘটতে পারে সেসব পথ অবলম্বন করো না। তিনি বলেন, "সেসব পথ অবলম্বন করো না যার ফলে এই পাপ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

(ইসলামী ওসুল কি ফিলাসাফী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১০, পৃ: ৩৪২)

অর্থাৎ কোন এমন আশঙ্কা বা সম্ভাবনাও যদি থাকে যে, মানুষ পাপের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। বর্তমান যুগে টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদিতে এমন অশ্লীল চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়, যাতে প্রকাশ্য ব্যভিচারে প্ররোচিত করা হয়। অতএব, এমন পাপ থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক আহমদীর কাজ। অনেক পরিবারে এই কারণে ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে। অনেক ঘর এই কারণে ভেঙে যাচ্ছে আর অনেক ঘর ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে। স্বামী বসে নোংরা চলচ্চিত্র দেখতে থাকে বা ইন্টারনেট নিয়ে বসে থাকে, যার ফলে ভ্রান্ত ও নোংরা চিন্তাধারা মাথায় আসে। এই কারণে অনেক যুবকের সর্বনাশ হচ্ছে। তারা অসৎ সঙ্গী সাথীর খপ্পরে পড়ছে। কেননা অশ্লীল ছবি দেখার প্রতি আসক্তি জন্মেছে। তথা-কথিত এই উন্নত বিশ্ব এটিকে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং উন্নতি মনে করে কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে এসব ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এরা নিজেরাই এখন বলে যে, এর ক্ষতিকর অনেক দিক রয়েছে। আপনারা যদি নিজে গিয়ে পর্নোগ্রাফি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহলে আপনারা দেখবেন যে এগুলো ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর পারিবারিক সহিংসতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠছে। শিশুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে আর এই সমস্ত কিছু অশ্লীল এসব চলচ্চিত্রের কারণে হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এমন ধারণাও যেন হৃদয়ে জাগ্রত না হয়। এমন ধারণা হৃদয়ে মাথাচাড়া দিলে তা এড়িয়ে চল। এখন প্রমাণিত হচ্ছে যে, এসব কিছু দেখার ফলেই এইসব পাপ সংঘটিত হচ্ছে। অতএব, একজন আহমদীকে বিশেষভাবে এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।

অতঃপর প্রকৃত বা সত্যিকার আহমদী হওয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সকল প্রকার জুলুম এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, আমার সাথে যদি সম্পর্কের দাবি করতে হয় তাহলে কোন প্রকার দুষ্কৃতি, অন্যায় এবং নৈরাজ্যের ধারণাও হৃদয়ে আনবে না। (মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬-৪৭)

মহানবী (সা.)কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, সবচেয়ে বড় অন্যায় এবং জুলুম কোনটি? তিনি (সা.) বলেন, সবচেয়ে বড় জুলুম এবং অন্যায় হলো নিজের ভাইয়ের জমির এক হাত পরিমাণও অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা। অর্থাৎ এই জমির একটি কঙ্কর বা ছোট একটি টুকরা, যা দুই আঙ্গুলের মাঝেও উঠানো সম্ভব, সে যদি তা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, তাহলে সেই কঙ্করের নিচের ভূমির যত স্তর আছে,হিসাব নিকাশের দিন সেই স্তরগুলোর বেড়ি বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে। সেই স্তরগুলোর হার বানানো হবে এবং তা তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৯-৬০)

মাটির নিচে ভূমির যে স্তরগুলো রয়েছে সে সেগুলোর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সহস্র সহস্র মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এখন মানুষ যদি চিন্তা করে তাহলে সে বুঝতে পারে যে, এই অন্যায়ের কারণে কত বড় বোঝা তার ওপর চাপানো হবে। এটি এত বড় শাস্তি যে, মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তাই কারো অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করা অনেক বড় পাপ। আমরা অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরি আর বলি যে, ইসলামী শিক্ষা মানবাধিকার প্রদানের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করে, ইসলাম অধিকার নেওয়ার পরিবর্তে দেওয়ার প্রতি বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমরা বড় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মানুষের সামনে এই কথাগুলো উপস্থাপন করে থাকি কিন্তু আমাদের কর্ম বা আমল যদি ভিন্ন হয় তাহলে আমরা পাপাচারী আর আমরা মিথ্যা বলছি। তাই প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয়টিকেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখতে হবে। আমাদের কর্ম যদি আমাদের শিক্ষা সম্মত হয়, কেবল তবেই আমাদের তবলীগও ফলপ্রসু হবে আর মানুষের ওপর আমাদের ভালো প্রভাব পড়বে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেই মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন আর যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যায়ের ধারণাও হৃদয়ে আসতে দিবে না, অন্যায় তো দূরের কথা কোনভাবেই যেন কারো প্রতি অবিচার না করা হয়।

অতঃপর মু'মিন হওয়ার গুরত্বপূর্ণ শর্ত হল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা। বরং আল্লাহ্ তা'লার মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ইবাদতকে আখ্যা দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"হে সেই সকল লোক! যারা নিজেদেরকে আমার জামা'তভুক্ত বলে মনে কর, আকাশে তোমরা তখনই আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হবে যখন সত্যিকার অর্থে তাকওয়ার পথে পদচারণা করবে। অতএব, নিজেদের পাঁচ বেলার নামাযকে এমন খোদাভীতি এবং এমন বিগলিত চিত্তে আদায় কর, যেন তোমরা খোদাকে দেখছ।"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৫)

তিনি আরো বলেন, নামায প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয বা অবশ্য পালনীয়। হাদীস শরীফে এসেছে রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে এক জাতির কিছু লোক এসে ইসলাম গ্রহণ করে আর নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের নামায মাফ করে দেওয়া হোক, কেননা আমরা ব্যবসায়ী মানুষ, পাঁচ বেলার নামায পড়া আমাদের জন্য খুবই কঠিন কাজ, আমাদের গবাদি পশু রয়েছে। বড় বড় পশুপাল পালন করি এবং চরাই। বাইরের কাজ বড় কষ্টের কাজ, কাপড়ও নষ্ট হয়ে যায়, কাপড়ের পবিত্রতার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। তাছাড়া ব্যস্ততার কারণে পাঁচ বেলা নামায পড়ার সময়ও থাকে না। প্রত্যুত্তরে তিনি (সা.) বলেন যে, দেখ! নামাযই যদি না থাকে তাহলে আর

থাকলই বা কী? সেটি কোন ধর্মই নয় যে ধর্মে নামায নেই। তিনি বলেন, নামায কী? নামায হলো বিনয় এবং আকুতি মিনতির সাথে নিজের দুর্বলতা আল্লাহ্‌র চরণে উপস্থাপন করে তাঁর কাছে অভাব মোচনের জন্য দোয়া করা। খোদাভীতি, খোদার ভালোবাসা এবং খোদার স্মরণে ব্যাপৃত থাকার নামই হলো নামায আর এটিই ধর্ম। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নামায থেকেই অব্যহতি চায়, সে পশুর চেয়ে বেশি কী ভালো কাজ করেছে? তার অবস্থা পশুর মতো। পানাহার করা আর পশুর মত ঘুমিয়ে থাকা, এটি তো ধর্ম নয়। এটি কাফের বা অবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫৩-২৫৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মানুষ এবং পশুর মাঝে পার্থক্য সূচক বিষয় হলো খোদার ইবাদত করা এবং নামায পড়া। নামায পড়ার প্রতি যদি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ না হয় তাহলে আমরা কোন্ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিজেরাই করতে পারি। আমি বেশ কয়েকবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং করে থাকি যে, মসজিদ বা নামাযের কেন্দ্র যদি দূরে থেকে থাকে, তাহলে কাছাকাছি কয়েকটি ঘর একত্রিত হয়ে একটি কেন্দ্র নির্ধারণ করতে পারে, যেখানে এক সাথে নামায পড়া সম্ভব হতে পারে। এরফলে যেখানে বাজামাত নামাযের পুণ্য লাভ হবে, সেখানে নামাযের প্রতি মনোযোগও নিবদ্ধ থাকবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হবে এবং তাদের সংশোধনও হতে থাকবে। নামাযের প্রতি তাদেরও মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আমরা মসজিদ নির্মাণের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি, মসজিদ নির্মাণ করছি, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ ভার্জিনিয়ায় একটি মসজিদের উদ্বোধন হবে। কিন্তু ইবাদতের প্রতি যদি আমাদের মনোযোগ বা আকর্ষণ না থাকে তাহলে এসব মসজিদ নির্মাণ করে লাভ কী? আমি বারংবার বলি যে, সব সংগঠনের ওহদাদারগণ এবং জামা'তী ওহদাদারগণ, (সকল পর্যায়ের জামা'তী ওহদাদারগণ) নামাযে উপস্থিতির প্রতি যদি পূর্ণ মনোযোগ দেন তাহলে নামাযের উপস্থিতি বেশ কয়েকগুণ বাড়তে পারে আর এটি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও তরবিয়ত হবে।

নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর একটি উক্তি এমন রয়েছে যা আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করবে। তিনি (সা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে বান্দাদের কাছ থেকে যে বিষয়ের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হলো নামায। এই হিসাব যদি সঠিক থাকে তাহলে সে সফল এবং মুক্তিপ্রাপ্ত। আর এই হিসাবে যদি গড়মিল থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি ব্যর্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

(সুনান আন নিসাঈ, কিতাবুস সালাত, বাবুল মুহাসিবা আলাস সালাত) অতএব নামাযের প্রতি মনোযোগের যে দায়িত্ব বর্তায় সেই দায়িত্ব পালন না করা সামান্য কোন বিষয় নয়। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন আর এই দায়িত্ব শুধু ফরয নামায আদায় করলেই হবে না বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাহাজ্জুদ এবং নফল পড়ার প্রতিও মনোযোগ থাকা চাই। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৫, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ) এছাড়া রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি রয়েছে যে, তোমাদের ফরয নামাযে যে ঘাটতি থেকে যায় সেই সমস্ত ঘাটতি আল্লাহ তা'লা নফলের মাধ্যমে পূর্ণ করেন। (সুনান নিসাই, কিতাবুস সালাত, বাবুল মুহাসিবা আলাস সালাত) যদি নফলের অভ্যাস থাকে তাহলে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ এবং নফল পড়াও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া চাই।

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যার প্রতি সব আহমদীর দৃষ্টি রাখা উচিত, তা হলো খোদার কাছে পাপের ক্ষমা চাওয়ার প্রতি স্থায়ী মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া। মানুষ দুর্বল, তাই ভুল থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক সময় ভুল হয়ে যায় আর খোদা তা'লা এমন নন যে, শুধু বান্দাদের ভুল ধরেন আর শাস্তি দেন বা ভ্রান্তির ওপরই কেবল তাঁর দৃষ্টি থাকে। এমন নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা এইসব ভুল ভ্রান্তির ক্ষমা লাভ এবং ভবিষ্যতে এগুলো থেকে মুক্ত থাকার উপায় এবং পন্থাও শিখিয়েছেন আর তা হলো ইস্তেগফার করা। রসূলে করীম (সা.) বলেন, খোদা তা'লা এমন নন যে, ইস্তেগফার করা সত্ত্বেও মানুষকে শাস্তি দিবেন। (আল আনফাল: ৩৪)

মানুষ ইস্তেগফারে রত থাকবে, আর ইস্তেগফারকারী যদি গুটিকতকও থেকে থাকে তাহলেও অনেকের পাপের ক্ষমা হয়ে যায় (তাদের কারণে অন্যদেরকে রক্ষা করা হয়)। এই সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কিছু মানুষ এমন হয়ে থাকে যে, নিজেদের পাপের কোন চেতনাই তাদের নেই। আর কিছু এমন আছে, যারা পাপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকে।সে কারণেই আল্লাহ্ তা'লা ইস্তেগফারের স্থায়ী বিধান করেছেন। পাপ করছি বলে চেতনা থাকুক বা না থাকুক মানুষ যেন ইস্তেগফারে রত থাকে। মানুষ জানে না যে, সে পাপ করছে কি করছে না। আল্লাহ্ তা'লা ইস্তেগফারের বিধানের ব্যবস্থা করেছেন যেন সকল পাপ তা বাহ্যিক হোক বা অভ্যন্তরীণ, তা সে জানুক বা না জানুক, হাত, পা, মুখ, নাক, কান, চোখ, তথা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পাপ থেকে সে যেন ইস্তেগফার করে। অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে সেগুলো পাপের কারণ হয়ে থাকে। তাই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য ইস্তেগফার করতে থাক। এ জন্যই বলেছেন যে, এগুলো পাপের কারণ হয়ে যায়। তাই খোদার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আশ্রয় পাওয়ার জন্য এই দোয়া করা উচিত। এর জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআনের এই দোয়া শিখিয়েছেন, যা বর্তমান যুগে পড়া উচিত আর সেই দোয়াটি হলো- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (সূরা আরাফ, আয়াত: ২৪) (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪৫) অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমরা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়ার্দ্র না হও, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

(সূরা আরাফ, আয়াত: ২৪)

তিনি বলেন, খোদার কাছে যদি শক্তি যাচনা করে অর্থাৎ ইস্তেগফার করে, তাহলে ফেরেশতার সাহায্যে তাদের দুর্বলতা দূরীভূত হতে পারে।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ : ৩৪)

পুনরায় হযরত মসহ্ মওউদ (আ.) নিজের মান্যকারীদের গণ্ডিভুক্ত হওয়ার জন্য যে প্রাথমিক শর্ত নির্ধারণ করেছেন তা হলো, তারা যেন মানুষের অধিকার প্রদানকারী হয় আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া থেকে তারা যেন বিরত থাকে।

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩, পৃ: ৫৬৪)

সর্বদা আত্মবিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি আমাদের বলেন- তোমাদের হৃদয়ে খোদাভীতি, খোদার ভয় আর এর ফলশ্রুতি স্বরূপ তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং হিত কামনা আছে কি? এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করবে না, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করবে না, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না, পরস্পরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে না, ব্যবসার সময় পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করবে না। পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান নিজের ভাইয়ের প্রতি অন্যায় অবিচার করতে পারে না, তাকে হেয় করতে পারে না, তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে না। নিজের মুসলমান ভাইকে হেয় জ্ঞান করাই কোন ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনের জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর এক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান হারাম।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, তাহরীমু যুলমুল মুসলিম, হাদীস-৬৫৪১)

এগুলো সেইসব বিষয় যা আজ সবচেয়ে বেশি আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হওয়া উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অনেকটা হচ্ছেও। সব মুসলমান যদি আজকে এই বাস্তবতাকে বুঝে এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর বিভিন্ন সরকার এবং মুসলমানরা যদি এগুলো মেনে চলে তাহলে বর্তমানে মুসলমান মুসলমানের ওপর অত্যাচার, অবিচার করে, তাদের যে ধনসম্পদ এবং প্রাণ বিনষ্ট করছে, সহস্র সহস্র, লক্ষ শিশু অনাথ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মহিলা বিধবা হচ্ছে, বয়োঃবৃদ্ধরা যে মারা যাচ্ছে- এগুলি কিছুই হতো না।

এছাড়াও অহংকার অনেক বড় একটি ব্যাধি, যা থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে আমাদেরকে নসীহত করেছেন। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) অনেক জোর দিয়েছেন এবং আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি (সা.) বলেছেন, যার হৃদয়ে সরিষা পরিমাণ অহংকারও বিদ্যমান থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব তাহরীমুল কিবর, হাদীস-২৬৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার মতে পবিত্র হওয়ার এটি উত্তম রীতি, বরং এর চেয়ে উত্তম কোন রীতি পাওয়া সম্ভব নয় যে, মানুষ কোন প্রকার অহংকার এবং গর্ব করবে না। না জ্ঞানের বড়াই করবে না বংশ গৌরবের আর না অর্থ-সম্পদের।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৪৫)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আমি আমার জামা'তকে নসীহত করছি যে, অহংকার পরিহার কর, কেননা অহংকার আমাদের মহাসম্মানিত ও মহাপ্রতাপান্বিত খোদার দৃষ্টিতে চরম ঘৃণ্য বিষয়।"

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪০২)

রসূলে করীম (সা.)ও বিদায় হজ্জের সময় বলেছেন, তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলী জাতি ও যোগ্যতা হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন হলেও মানুষ হিসেবে তোমরা একই শ্রেণীভুক্ত। সবার মর্যাদা সমান। কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের আর শ্বেতাঙ্গের ওপরকৃষ্ণাঙ্গের, আরবের ওপর অনারবের আর অনারবের ওপর আরবের কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

(আল জামিয়ো লি শুয়াবিল ঈমান, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৩২, হাদীস- ৪৭৭৪)

অতএব, আমাদের জন্য এটিই হলো বিনয় ও সাম্যের শিক্ষা। এটিই অহংকার এবং গর্ব থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষা, যা আমাদের সবার মেনে চলা উচিত। অমুসলিম বিশ্বে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে ভেদাভেদ করা হয়। আর এখন কিছু শ্বেতাঙ্গ নেতা এই দাবিও করছে যে, শ্বেতাঙ্গদের বৌদ্ধিক যোগ্যতা এবং সামর্থ্য তাদের থেকে বেশি যারা শ্বেতাঙ্গ নয়। এই হলো তাদের দাম্ভিকতার চিত্র। সকল আহমদীকে এটি থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত।

এখানে আমেরিকায় দু'টো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমার সাথে মজলিসে বা বৈঠকে মেয়েদের পক্ষ থেকে এই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জামা'তে কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য রয়েছে। কোন কারণে যদি যুবক শ্রেণির মাঝে এই ধারণা মাথা চাড়া দেয়, তাহলে এটি খুবই অন্যায় একটি কাজ। লাজনা, খোদ্দাম, আনসারেরও আর জামাতী তরবিয়তী বিভাগেরও এটি খতিয়ে দেখা উচিত যে, এই প্রশ্ন কেন মাথাচাড়া দিচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে যদি কোন বাস্তবতা থেকে থাকে, তাহলে বুদ্ধিমত্তার সাথে, ভালোবাসার সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই প্রবৃত্তির সুরাহা করা উচিত এবং তরবিয়তও করা উচিত। কোন সংগঠন বা ওহদেদারের তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয় আর এই তদন্তে রত হবেন না যে, কে বলেছে বা কী বলেছে, বরং এটি দেখুন যে, বিষয়টা কী আর এর কোন বাস্তবতা আছে কি না। অতএব, দেখতে হবে যে, এই কথাটা সত্য কি না, যদি সত্য না হয়ে থাকে তবে কেন এই প্রশ্ন উঠছে? ব্যক্তিগত মনোমালিন্য তো নেই যার কারণে এসব হচ্ছে। কারণ যাইহোক, ভালবাসা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এই ব্যধিকে আমাদের মধ্য থেকে বের করে দিতে হবে। এখানে যে মেয়েটি আমাকে একথা বলেছিল তাকেও আমি একথাই বলেছি যে, আমাকে ঘটনার পুরো বৃতান্ত লিখে পাঠাও যে কি কারণে তোমার মনে এমন চিন্তার উদয় হয়েছে যে জামাতের বর্ণ বৈষম্য তৈরী হচ্ছে? যাহোক, এটিও একপ্রকার অহংকার আর সকল প্রকার অহংকার থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে।

একটি কথা, যার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর যা সম্পর্কে খোদা তা'লারও শিক্ষা রয়েছে এবং মহানবী (সা.)-এরও উক্তি রয়েছে, তা হলো-আর্থিক কুরবানী। খোদা তা'লার কৃপায় সারা পৃথিবীর জামাত'গুলো আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে উন্নতি করছে। জরুরী অবস্থায় এবং সাময়িক কুরবানীর ক্ষেত্রে আমেরিকার জামা'তগুলো উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়ে থাকে কিন্তু রীতিমত আমাদের যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে বা আবশ্যকীয় চাঁদার যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, পরিসংখ্যান অনুসারে বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি রয়েছে। এদিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এক দরিদ্র ব্যক্তি, নিজের সমস্যা ও বাধ্যবাধকতার কথা বলে কমহারে চাঁদা দেওয়ার অনুমতি নিতে পারে কিন্তু যাদের আয় উপার্জন ভালো, তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত এবং এটি দেখা উচিত যে, আয় অনুসারে তারা চাঁদা দিচ্ছে কি না। শুধু এটি হওয়া উচিত নয় যে, কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য মানুষ যেভাবে অনেকে বেশি খরচ দেখিয়ে থাকে, চাঁদার ক্ষেত্রেও সে তা-ই করবে। আপনার আয় দেখুন, কেননা চাঁদার বিষয়টি খোদার সাথে লেনদেনের বিষয় বা বোঝা পোড়ার বিষয়। সেক্রেটারী মাল বা ব্যবস্থাপনা জানে না যে, কার আয় বা উপার্জন কী বা কতটা উপার্জনের ওপর চাঁদা দিচ্ছে, কিন্তু খোদা তা'লা জানেন, কেননা তিনি অন্তর্যামী। সঠিকহারে যদি চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেন, তাহলে আমি মনে করি মসজিদ নির্মাণ এবং অন্যান্য জামাতী কাজের জন্য পৃথক কোন তাহরীক কমই করতে হবে। এদিক থেকে আপনারা আত্মবিশ্লেষণ করুন আর যারা কম লিখিয়েছেন তারা নিজেদের চাঁদা আমের বাজেট পুনর্বিবেচনা করে লেখান।

বিভিন্ন দেশে নতুন বয়আতকারীদের ঘটনাবলী আপনাদেরকে আমি শুনিয়ে থাকি যে, আহমদীয়াত গ্রহণের পর কীভাবে তারা নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করেছেন আর আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধন করছেন। কার্যত ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করছেন এবং আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব তারা বুঝেছেন, আর এ কারণে দারিদ্র হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করছেন আর এ কারণে ঈমান এবং নিষ্ঠায় তারা উন্নতি করছেন। কুরবানী শব্দের অর্থই এটি। এই শব্দের স্পষ্ট অর্থও রয়েছে আর তা হলো নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে কোন কাজ করা। আর এখানে নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে আল্লাহ্‌র ধর্মের প্রয়োজনে চাঁদা দেওয়ার কথা হচ্ছে। নিজেকে কোন কষ্টে না ফেলে যারা অল্পস্বল্প চাঁদা দেয় আর মনে করে যে, আমরা কুরবানী করেছি, এটি কোন কুরবানী নয় আর এটি ত্যাগ স্বীকার করা নয় আর এমন মানুষের আল্লাহ্ তা'লার ওপর কোন অনুগ্রহও নেই। তারা না দিলেও খোদা তা'লা ধর্মের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করবেন আর করে থাকেন এবং করছেন আর করবেন, ইনশাআল্লাহ্। তাই যারা স্বচ্ছল থাকা সত্ত্বেও আয় অনুসারে চাঁদা দেয় না, আমি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যেন তারা ঐশী কৃপারাজির উত্তরাধীকারী হতে পারে।

আজকে যে শেষ কথার প্রতি আমি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই তা হলো আনুগত্য। কুরআন শরীফের বহু জায়গায় আল্লাহ্ এবং রসূলের আনুগত্যের নির্দেশ এসেছে আর শাসকদেরও আনুগত্যের নির্দেশ রয়েছে। এরপর বয়আতের শর্তাবলীতেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এতায়াত সংক্রান্ত শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ আমরা 'মারুফ' (ধর্মানুমোদিত) বিষয়ে আনুগত্যের অঙ্গীকারের উপর আমৃত্যু প্রতিষ্ঠিত থাকব।

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩, পৃ: ৫৬৪)

আমাদের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনে যে 'আহাদনামা' (অঙ্গীকার বাক্য) রয়েছে, তাতেও এই শব্দ অন্তর্ভুক্ত আছে যে, খলীফায়ে ওয়াক্ত যে 'মারুফ' (ধর্মানুমোদিত) সিদ্ধান্ত করবেন তা মেনে চলা আবশ্যক জ্ঞান করব। বক্রপ্রকৃতির কতক মানুষ বা কপটতামূলক চিন্তাধারার মানুষ বলে যে, আমরা অঙ্গীকার করেছি 'মারুফ' বিষয়ের আনুগত্যের। এরা বলে যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের কোন কোন সিদ্ধান্ত 'মারুফ' হয় না বা ন্যায়সঙ্গত হয় না বা তাদের দৃষ্টিতে কোন কোন সিদ্ধান্ত ন্যায় সঙ্গত নয়।তারা এই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এমন চিন্তা ধারা রয়েছে। এমন মানুষ দু'একজন হলেও, হয়ত লক্ষে একজন হবে। কিন্তু এই চিন্তাধারাকে প্রতিহত করা আবশ্যক, কেননা এটি নতুন প্রজন্মকে বিষিয়ে তোলে। এমন চিন্তাধারা অর্থাৎ 'মারুফ' (সংগত) সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা যদি এরা নিজেরাই করা আরম্ভ করে, তাহলে জামাতের ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকবে না। তখন এই বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যাবে যে, মারুফ কাকে বলে আর 'গয়ের মারুফ' কী। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) এক জায়গায় বলেন-

"আরেকটি বিভ্রান্তি রয়েছে যা 'মারুফ' বিষয়ের আনুগত্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। অর্থাৎ, 'মারুফ' সিদ্ধান্তের আনুগত্য করা।" তিনি বলেন, "যেসব বিষয়কে আমরা 'মারুফ' মনে করি না সেই ক্ষেত্রে আমরা আনুগত্য করব না।" তিনি বলেন, এই শব্দটি রসূলে করীম (সা.)-এর জন্যও কুরআন শরীফে এসেছে আর কুরআন শরীফে আছে-''وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ'' (সূরা মুমতাহিনা: ১৩) অর্থাৎ 'মারুফ' (সংগত) বিষয়ে তোমার অবাধ্য হবে না। তিনি বলেন, এমন লোকেরা কি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দুর্বলতারও কোন তালিকা প্রস্তুত করেছে?

(হাকায়েকুল ফুরকান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৫-৭৬) অর্থাৎ তিনি কোন্ কথা সঠিক বলেছেন আর কোন্ কথা ভুল বলেছেন। "ইয়ামুরু বিল মারুফ"-এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এই রসূল সেসব কথার নির্দেশ দেন যা বিবেক পরিপন্থী নয়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ৪২০)

অর্থাৎ 'মারুফ' বিষয় হলো সেগুলো যেগুলো বিবেক বা যুক্তি পরিপন্থী নয় আর সেগুলো কুরআনের নির্দেশ এবং শিক্ষা সম্মতও হয়ে থাকে। এক হাদীসে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এক জায়গায় মহানবী (সা.) একটি কাফেলা প্রেরণ করেন। এক জায়গায় পৌঁছে সেখানে তারা আগুন প্রস্তুত করেন এবং কাফেলার আমীর তাদেরকে বলেন যে, আমি যদি তোমাদেরকে এই আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার নির্দেশ দিই, তোমরা কি ঝাঁপিয়ে পড়বে? কোন সাহাবী বলেন যে, এটি অন্যায় কথা, এটি আত্মহত্যা। কেউ কেউ বলে যে, আমীরের আনুগত্য আবশ্যক। কিন্তু যাই হোক সেই আমীর বলেন যে, আমি রসিকতা করছিলাম। মদীনায় এসে মহানবী (সা.)-কে যখন এই ঘটনা শোনানো হয় তখন তিনি (আ.) বলেন, আমীরদের মধ্যে যে তোমাদেরকে খোদার অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ দেয় সে ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করবে না।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস- ২৬২৫)

এটি হলো মারুফের ব্যাখ্যা। আল্লাহ্‌র যে নির্দেশ রয়েছে, সেই নির্দেশ পরিপন্থী যদি কোন কথা হয় তাহলে সেটি মারুফ নয়, কিন্তু যদি খোদা এবং রসূলের শিক্ষা সম্মত নির্দেশ হয়ে থাকে, তাহলে সে নির্দেশ মারুফ নির্দেশ, তাই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মারুফ সিদ্ধান্ত বা মারুফ বিষয়ের আনুগত্য, যে আনুগত্য আবশ্যক, তা হলো খোদা তা'লার নির্দেশ এবং তাঁর রসূলের শিক্ষা এবং নির্দেশাবলীর আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। তাই সত্যিকার খেলাফত যত দিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এটি ইনশাআল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত থাকবেই, এই খেলাফত কখনো আল্লাহ্‌ এবং রসূলের নির্দেশ পরিপন্থী সিদ্ধান্ত দিবে না এবং কুরআন ও সুন্নতের অধীনেই চলবে।

আর মারুফ বিষয়ে আনুগত্য করার কথাটি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তা'লা মহানবী (সা.) এর জন্যও ব্যবহার করেছেন। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)ও তাঁর বয়আতের শর্তাবলীতে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর আহমদীয়া খেলাফতের অধীনে প্রতিটি অঙ্গসংগঠনের আহাদনামায় এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী জারি করা এবং জামাতকে নসীহত করা আর উপদেশ দেওয়া যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে নিজেকে জামা'তের অংশ মনে করে তার জন্য আবশ্যক হলো এই অঙ্গীকার বা আহাদনামার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে জামাতসংক্রান্ত খলীফায়ে ওয়াক্তের যে নির্দেশ রয়েছে বা আসে সেগুলো মেনে চলা, সেগুলোকে ব্যবহারিক রূপ দেওয়া। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এটি কখনো হতে পারে না আর কোন সময় কোন ভুল নির্দেশনা দিলেও আল্লাহ যেহেতু খিলাফতের নিরাপত্তা বা হেফাজতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তাই আল্লাহ তা'লা কখনো এর অশুভ ফলাফল প্রকাশ পেতে দিবেন না আর এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন যে, ভালো ফলাফলই সামনে আসবে।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৭৬-৩৭৭, সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)

তাই মারুফ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব কোন ব্যক্তির নয়, মারুফ সিদ্ধান্ত সেটি যা কুরআন সম্মত এবং সুন্নত সম্মত এবং হাদীস সম্মত আর এ যুগের হাকাম এবং আদাল-এর নির্দেশাবলী সম্মত। আর এটিই সেই মাধ্যম যার কল্যাণে জামা'তের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে আর এই উদ্দেশ্যেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রেরিত হয়েছেন। অর্থাৎ ঐক্য সৃষ্টির জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন। আর নিষ্ঠাবান এবং আনুগত্যশীল লোকদের একটি জামাত সৃষ্টি করাই ছিল উদ্দেশ্য। নতুবা মসীহ্‌ মওউদ (আ.) স্পষ্ট করেছেন যে, সংখ্যা বৃদ্ধি আমার উদ্দেশ্য নয় অর্থাৎ এমন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য নয় যারা আনুগত্যই করতে জানে না। তিনি বলেন, যদি আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকদের এবং আমার হাতে বয়আতকারীদের সংশোধন না হয়, তারা আল্লাহ্‌ এবং রসূলের শিক্ষা অনুসারে যদি জীবন যাপন না করে, তাহলে এমন বয়আত অর্থহীন।"

(মোয়াহেবুর রহমান, রূহা নী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২৭৬) (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৪)

তাই আমাদের আহমদী হওয়া তখনই উপকারে আসবে যখন এই সত্যকে বুঝে আমরা এর ওপর আমল করার চেষ্টা করব আর নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) বলেন, আনুগত্য কোন সামান্য বিষয় নয় বা কোন সহজ কাজ নয়। এটি এক প্রকার মৃত্যুই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি পুরোপুরি আনুগত্য করে না, সে জামাতের জন্য দুর্নাম বয়ে আনে।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৪)

তিনি বলেন, আমি আমার জামাতকে বার বার বলেছি যে, তোমরা নিছক এই বয়আতের ওপরই নির্ভর করো না। যতক্ষণ পর্যন্ত এর বাস্তবতাকে অনুধাবন না করবে অর্থাৎ বয়আতের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন না করবে ততক্ষণ মুক্তি পাবে না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩৩-২৩৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সবাইকে ইসলামের প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ বুঝে এর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। হযরত মসীহ্‌মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের ফলে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় সেই দায়িত্ব যেন আমরা পালন করতে পারি আর সব সময় খেলাফতের সাথে সত্যিকার আনুগত্যের সাথে যেন আমরা সংশ্লিষ্ট থাকি। খলীফায়ে ওয়াক্তের সকল মারুফ সিদ্ধান্তের ওপর আন্তরিকভাবে এবং পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আমরা যেন আমল করতে পারি। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার

হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ মুসলেহ মওউদ (রাযি.)
অনুবাদ-মোরতজা আলি (বড়িশা)

বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতেই এই ধারণা প্রচলিত যে পৃথিবী চ্যাপ্টা। কিন্তু মুসলমানদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল পৃথিবী গোল। ইউরোপের লোকেরা এই ধারণা ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করত। কোন এক সময় পৃথিবী গোল কি না সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠল এবং এই প্রশ্ন ইউরোপের অধিবাসীরা অস্বীকার করল ও তীব্রভাবে বিরুদ্ধাচরণ করল। যখন এই দুই মতবাদ নিয়ে মতভেদ চলছিল ঠিক সেই সময়েই কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কল্পনা সৃষ্টি হয়। হযরত মহীউদ্দীন ইবনে আরবী (রা.)-এর কোন এক শিষ্যের ছাত্র ছিলেন কলম্বাস। তিনি কয়েকটি স্বপ্ন এবং দিব্যদর্শনের মাধ্যমে এই কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করেন তার ইঙ্গিত ছিল সম্ভবত ভারতের দিকে। কলম্বাস তাঁর শিক্ষকের কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে ভারতবর্ষে পৌঁছানো জন্য স্থির সংকল্প হলেন। এই যাত্রার জন্য উপযুক্ত অর্থ এবং অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন ছিল কিন্তু কলম্বাসের কাছে সেই অর্থ এবং অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করার মত সঙ্গতি ছিল না। তিনি ভারত আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে কিছু ক্ষমতাবান ব্যক্তির মাধ্যমে স্পেনের রাজার কাছে আবেদন করলেন, যাতে রানী রাজার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এই প্রস্তাব রাণীর পছন্দ হল এবং তিনি ভাবলেন যে যদি এই মহৎ কার্যে সাফল্য লাভ করে তবে তার দেশ খুবই লাভবান হবে। তাই তিনি রাজার কাছে আবেদন জানাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং আবেদন করলেন। তখন রাজা তার সভাসদসদের নিয়ে পরামর্শ করলেন কিন্তু ইউরোপীয়গণের ধারণা ছিল যে পৃথিবী চ্যাপ্টা। পোপের একজন প্রতিনিধি এই ধারণাকে দারুনভাবে উপহাস করে বললেন যে, কলম্বাসের সমস্ত ধারণা ভুল এবং সে এইভাবে এতদিনে প্রচলিত বিশ্বাসকে অস্বীকার করছে। এই রকম একজন নির্বোধ ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করা জ্ঞান-বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তিনি তীব্র বক্তৃতার মাধ্যমে কলম্বাসের ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করলেন এবং ভারতবর্ষ যদি স্পেনের সমুদ্রের অপর পারেই থাকে তবে তো এই ভূখণ্ডের অপর পারের লোকেরা শূন্যে ঝুলছে। অতএব, কলম্বাস পৃথিবী বলে আমাদের স্বীকার করাতে চাইছেন যে পৃথিবীর অপর প্রান্তে বসবাসকারী লোকদের পা গুলি উপরের দিকে এবং মাথা নিচের দিকে রয়েছে। সেখানে যে সকল বৃক্ষরাজি জন্মায় মহাশূন্যে সেগুলির শিকড় উপরের দিকে এবং বৃক্ষরাজি মহাশূন্যে দোদুল্যমান। ঐ সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত নীচের দিকে না হয়ে উপরের দিকেই হয়ে থাকে এবং সূর্য সেখানে নীচের দিকেই উদিত হয়।

এইভাবে সে পাদ্রী তার ভণ্ডধারাকে এমন শাণিত বাণে পরিস্ফুট করলেন যে জনসাধারণ এই ধারণাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন এবং ভাবলেন যে কলম্বাস একজন প্রতারক ও তার মত লোককে কখনও সাহায্য করা উচিত নয়। সকলেই বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে কলম্বাসের যাত্রা দীর্ঘদিন স্থগিত রইল। অবশেষে রাণী তাঁর নিজ আয় থেকে কলম্বাসকে অর্থ প্রদান করলেন এবং কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন। যার দ্বারা স্পেনবাসীরা খুবই লাভবান হলেন।

(ইনকিলাবে হাকীকী নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

أُوصِيكُمْ بِالْجَارِ

(আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি)

নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার এটিও এক অব্যর্থ উপায়।

-হাদীস

ইমামের বাণী

"খোদা তা'লা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমাকে বহু সম্মানে বিভূষিত করিবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া দিবেন" *-তাজাল্লিয়াতে ইলাহি বা ঐশী বিকাশ, পৃ: ১৬*

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

নারী মুক্তির অগ্রদূত হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)

মূল-হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.), অনুবাদ:-মওলানা রশিদ আহমদ

আমার কাছে আবেদন করা হয়েছে, আমি যেন আল-ফযরে বিশেষ সংখ্যার জন্য প্রবন্ধ লিখি। আমি মনে করি, এই সংখ্যা, যাতে রসুল করীম (সা.)-এ সুউচ্চ মান ও মর্যাদা তুলে ধরার জন্য প্রকাশিত হচ্ছে এর জন্য প্রবন্ধ রচনা করাও পুণ্যের কাজ। সুতরাং আজকাল ভীষণ ব্যস্ততা এবং সেই সাথে অসুস্থতা সত্ত্বেও একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

রসুলে করীম (সা.) এর জীবনের প্রতিটি দিক এত চিত্তাকর্ষক যে, মানুষ দ্বিধান্বিত হতে বাধ্য হয় কোনটি গ্রহণ করব আর কোনটি ছাড়ব। বাছাই করতে গিয়ে চোখ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যায়। তবে আমি বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে, তাঁর (সা.) ব্যবহারিক জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট দিকটি বাছাই করেছি। অর্থাৎ তিনি (সা.) কিভাবে দুনিয়াকে সেই দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন যা দীর্ঘকাল যাবৎ পৃথিবীর গলার হার হিসেবে শোভা বর্ধন করছিল। আর সেটি হল মহিলাদের দাসত্ব।

রসুল করীম (সা.)-এর আগমণের পূর্বে মহিলারা সকল দেশে দাসী ও পরাধীন ছিল। তাদের দাসত্ব এমন ছিল যে, দাসী মৃত্যুবরণ করলেও তার দাসত্ব বিলীন হত না কেননা দাসীর সন্তান মুক্তির স্বাদ পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে পারত না। যদিও এতে সন্দেহ নাই, সর্বদা নারী জাতির স্বীয় রূপ-লাবণ্য বা বুদ্ধিমত্তার জোরে কিছু পুরুষের উপর প্রাধান্য কায়েম করে আসছে; কিন্তু এই স্বাধীনতা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। কেননা এসব তারা অধিকার হিসেবে লাভ করে নি, বরং এগুলি ব্যতিক্রম ছিল। আর এই ব্যতিক্রমী স্বাধীনতা কখনও সঠিক স্পৃহা জাগত্র করার কারণ হতে পারে না।

রসুল করীম (সা.)-এর আবির্ভাব আজ থেকে সাড়ে তের শত বছর পূর্বে হয়েছিল। তখন পর্যন্ত কোন ধর্ম এবং জাতি মহিলাদের এমন স্বাধীনতা প্রদান করে নি যা তারা নিজেদের অধিকার হিসেবে ভোগ করতে পারত। নিঃসন্দেহে কিছু দেশ যেখানে কোন প্রকার আইন কানুন ছিল না সেখানে সবাই সকল প্রকার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু একেও স্বাধীনতা বলা যায় না, বরং একে উচ্ছৃঙ্খলও বলা যায়। স্বাধীনতা হল তা যা সভ্যতা ও সামাজিক রীতি-নীতির কায়দা কানুনের চাহিদা নিবারণ করে অর্জিত হয়। সেই আাইন-কানুন ভঙ্গ করে যা আজ অর্জিত হয় তাকে স্বাধীনতা বলা যায় না, কেননা তা উচ্চাকাঙ্খা ব বীরত্ব সৃষ্টির পরিবর্তে হীনমন্যতা সৃষ্টির কারণ হয়।

রসুল করীম (সা.)-এর যুগে এবং তাঁর পূর্বে মহিলাদের এমন অবস্থা ছিল যে, সে নিজের সম্পত্তির মালিক ছিল না, তার স্বামীকে তার সম্পত্তির অধিকারী মনে করা হতো। তাকে তার পিতার সম্পত্তি থেকে কোন অংশ দেওয়া হত না। তাকে তার স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিনীও মনে করা হত না। যদিও কিছু কিছু দেশে তার জীবদ্দশায় সে তার সম্পত্তির রক্ষক হতে পারত। যখন তার বিবাহ কোন পুরুষের সাথে হত তখন তাকে সারা জীবনের জন্য সেই পুরুষের অধিকারভুক্ত বলে গণ্য করা হতো। আর স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার কোন এখতিয়ার তার ছিল না কিন্তু স্বামীর অধিকার ছিল তাকে পৃথক করে দেওয়ার। মহিলার যত কষ্টই হোক না কেন তার কোন অধিকার ছিল না তার স্বামীর থেকে পৃথক হওয়ার। স্বামী যদি তাকে ছেড়ে দেয় আর তার সাথে যদি কোন যোগাযোগ না রাখে বা কোথাও পালিয়ে যায় তবে তার অধিকার রক্ষার কোন আইন ছিল না। সেই মহিলর কর্তব্য মনে করা হত যে, সে তার সন্তানদের এবং নিজেকে সংযত রাখবে আর কাজ কর্ম করে নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণ করবে। স্বামীদের এই অধিকার ছিল, সে তার স্ত্রীকে মারপিট করবে কিন্তু স্ত্রী টু শব্দটিও করতে পারবে না। কিছু কিছু দেশে স্বামীর মৃত্যু হলে তাকে স্বামীর আত্মীয় স্বজনদের অধিকার ভুক্ত মনে করা হত। তারা অনুগ্রহের ছলে বা দাম দিয়ে তাকে যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে সম্বন্ধ করিয়ে দিত। কিছু কিছু স্থানে তাকে স্বামীর সম্পত্তি মনে করা হত। কিছু স্বামী তাকে বিক্রি করে দিত বা জুয়া আর শর্তে বাজি হিসেবে স্ত্রীকে উপস্থাপন করত। এই পদ্ধতি স্বামীর অধিকারভুক্ত বলে গণ্য হত। মহিলারা তাদের সন্তানদের উপর কোন প্রকার অধিকার দাবি করতে পারত না স্বামীর ঘরে থাকা অবস্থায় বা তার থেকে পৃথক থাকা অবস্থায়। মহিলারা সংসারের বিষয়াবলীতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারত না। ধর্মীয়ভাবেও মনে করা হত তারা কোন মর্যাদা রাখে না, চিরস্থায়ী অনুগ্রহরাজিতেও তাদের কোন অংশ নেই। এর ফলে স্বামী তার স্ত্রীর সম্পত্তি হেসে খেলে উড়িয়ে দিত আর তার খোরপোষো কোন উৎস না রেখেই ছেড়ে দিত। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার স্বামী তাকে অনুমতি দিত সেই হতভাগিনীরা নিজ সম্পত্তি থেকে সদকা–খায়রাত বা আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য সহযোগিতা করার দুঃসাহস দেখাতে পারত না। আর সেই সকল স্বামী যাদের দৃষ্টি তাদের সম্পত্তির উপর থাকত এ ব্যাপারে অনুমতিও দিত না। পিতা-মাতা যাদের সাথে তার নাড়ির ছেড়া সম্পর্ক তাদের সম্পত্তি থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হত, অথচ মেয়েরাও তাদের সেরূপ স্নেহ-মমতার অধিকারিণী যেরূপ ছেলেরা। যে পিতা মাতা এই ত্রুটি দেখে সংশোধনের উদ্দেশ্যে মেয়েদেরকে তাদের জীবদ্দশায় কিছু দিত তা নিয়ে তাদের স্বামীদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ লেগে যেত। কেননা ছেলে তো এটি ভাবত না যে, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সকল সম্পত্তির সে ওয়ারিশ হবে তবে সে এটি অনুভব করত যে, তার পিতা-মাতা তার তুলনায় মেয়েদের বেশি দিয়েছে। একইভাবে স্বামী, যার সাথে পরম আস্থার সম্পর্ক হয়ে থাকে তার সম্পত্তি থেকেও তাদের বঞ্চিত রাখা হত। স্বামীর দূরসম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন তার সম্পত্তির উত্তারিধিকারী হতো কিন্তু সেই নারী যে তার স্বামীর অন্দরমহল ও জীবনভর সাথী, স্বামীর আয়-উপার্জনের বহুলাংশ জুড়ে যার পরিশ্রম ও কাজ কর্ম জড়িয়ে ছিল তার সম্পত্তি থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হত। অথবা তাকে তার স্বামীর সকল সম্পত্তির তৃত্তাবধায়ক নিযুক্ত করা হত কিন্তু তার অংশ ব্যয় করা থেকে বঞ্চিত থাকত। সে সেই সম্পত্তির আয় থেকে খরচ তো করতে পারত কিন্তু সেটির কোন অংশ ব্যবহার করতে পারত না। আর এভাবেই তারা অনেক সদকা জারিয়াতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত রয়ে যেত। স্বামীরা তাদের উপর যতই নির্যাতন করুক না কেন তারা তাদের থেকে পৃথক হতে পারত না। আর এমন কিছু জাতি ছিল যাদের মহিলারা যদি স্বামীদের থেকে পৃথক হতে চাইত তবে এমন সব শর্ত আরোপ করা হত যে অনেক ভদ্র মহিলা পৃথক হওয়ার চেয়ে মৃতুকে শ্রেয় মনে করত। উদাহরণ স্বরূপ পৃথক হওয়ার এমন শর্ত ছিল যে, স্বামী বা স্ত্রীর ব্যাভিচার প্রমাণিত হতে হবে সেই সাথে অত্যাচার করা হয় এটিও সাব্যস্ত হতে হবে। এর চেয়েও বড় অবিচার ছিল, অনেক ক্ষেত্রে যখন মহিলাদের স্বামীর সাথে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠত তখন তাদের পরিপূর্ণ মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে কেবল মাত্র পৃথক থাকার অধিকার প্রদান করা হত। আর এটি এক প্রকার শাস্তি ছিল, কেননা এভাবে তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে নিজ জীবনযাপনে বাধ্য হতো। আবার এটিও হত, স্বামী যখন ইচ্ছা তখন স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারত কিন্তু মহিলাদের স্বামীদের থেকে পৃথক হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করার কোন অধিকার ছিল না। যদি স্বামী তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন না করে পৃথক হয়ে যায় বা দেশ ছেড়ে চলে যায় আর কোন খবরা-খবর না নেয় তবে জীবনভর তার স্বামীর অপেক্ষা করতে মহিলাদের বাধ্য করা হত। তার জীবন দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্যয় করা কোন অধিকার ছিল না। বৈবাহিক জীবন তার জন্য আরাম আয়েশের পরিবর্তে গলার কাটা হয়ে দাঁড়াত। সে পরিবারের সকল কাজ-কর্ম করত আবার স্বামীর জন্য অপেক্ষাও করত। স্বামী যা আবশ্যকীয় কাজ অর্থাৎ সংসার নির্বাহ করা এটিও স্ত্রীর কাঁধে পড়ত, সেই সাথে সন্তানদের দেখভাল করা তাদের লালন পালন করা যা মহিলাদের স্বীয় দায়-দায়িত্ব তাও তাদের উপর অর্পিত হত। একদিকে হৃদয়ের অশান্তি অপরদিকে নারীর দায়-দায়িত্ব সব কিছু একটি নিরীহ জীবনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত।

মহিলাদের সাথে মারপিট করা স্বামীর বৈধ অধিকার হিসেবে গণ্য করা হত। স্বামী মৃত্যু বরণ করলে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে বলপ্রয়োগ করে বিয়ে দেওয়া হত বা কোন ব্যক্তির কাছে অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করা হত। এমনকি স্বামী তার স্ত্রীকে বিক্রি করে দিত। পাণ্ডোর মতে সুখ্যাতি সম্পন্ন শাহযাদা তার স্ত্রীকে জুয়া খেলায় হারিয়ে বসে আর দেশের প্রচলিত আইনের সামনে ধ্রুপদীর মত শালীন ভদ্র শাহযাদী টু শব্দটিও করতে পারে নি। বাচ্চাদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় মায়েদের কোন রায় গ্রহণ করা হত না। তাদের সন্তানদের উপর তাদের কোন অধিকার প্রদান করা হত না। মাতা-পিতার মাঝে ছাড়াছাড়ি হলে

সন্তানদের পিতার অধীনে দেওয়া হত। পারিবারিক বিষয়াবলীতে মহিলদের হস্তক্ষেপ সহ্য করা হতো না, স্বামীর জীবদ্দশাতেও না আর মৃত্যুর পরেও না। স্বামীর ইচ্ছা হলেই তাকে ঘর থেকে বের করে দিত আর তারা উদ্ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত।

রসূল করীম (সা.)-এর মাধ্যমে এই সকল অত্যাচারের মূলাৎপাটিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, খোদা তা'লা আমাকে মহিলাদের অধিকারের রক্ষক হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি, মানুষ হিসেবে নর ও নারী সমান। যখন তারা একত্রে মিলেমিশে কাজ করবে তাখন মহিলাদের উপর পুরুষদের কিছু অধিকার লাভ হয় অনুরূপভাবে পুরুষদের উপরও মহিলাদের কিছু অধিকার লাভ হয়। পুরুষদের মত মহিলারাও সম্পত্তির মালিক হতে পারে। স্ত্রীর সম্পত্তি ব্যবহার করার কোন অধিকার স্বামীর নেই যতক্ষণ পর্যন্ত স্বী স্বপ্রণোদিত হয়ে তাকে কিছু দান করবে। স্ত্রীর কাছ থেকে জোরপূর্বক সম্পদ নেওয়া বা এমন পরিস্থিতি তৈরী করে স্ত্রীর নিকট সম্পদ নেওয়া অনুচিত যাতে স্ত্রী লজ্জায় তার স্বামীকে দিতে বাধ্য হয়। স্বামীও যদি কিছু উপহার স্বরূপ তাকে দেয় তবে সেই উপহার মহিলার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে আর স্বামী তা পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবে না। সেও তার পিতা-মাতার সম্পদের সেভাবে উত্তরাধিকারিণী হবে যেভাবে ছেলে তার পিতা-মাতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, যেহেতু পুরষের উপর পরিবারের দায়িত্বভার অর্পিত থাকে তাই সে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক পাবে। অনুরূপভাবে মাতা তার পুত্রের সম্পদ থেকে সেভাবেই অংশ লাভ করবে যেভাবে পিতা লাভ করে থাকে। যদিও অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং দায়-দায়িত্বের দিক থেকে কখনও পিতার সমান আর কখনও কম পেয়ে থাকে। সন্তান-সন্ততি থাক বা না থাক স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদেরও উত্তরাধিকারিণী হবে যাতে তাকে অন্যের নিকট হাত পাততে না হয়। নারীর বিবাহ নিঃসন্দেহে একটি পুতঃপবিত্র বন্ধন। নর-নারী পারস্পরিক অকৃত্রিম বন্ধন স্থাপনের পর তা ছিন্ন করা সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু এটি হতে পারে না যে, স্বামী-স্ত্রীর স্বভাবের মাঝে ভয়ানক মতপার্থক্য থাকা বা ধর্মীয়, শারীরিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক বিভাজন থাকা সত্ত্বেও সে বাধ্য হবে, এই বন্ধন অটুট রাখার জন্য তার জীবন বিনষ্ট করবে আর তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ভুলে বসবে। যখন এমন বিভাজন সৃষ্টি হবে আর পুরুষ ও মহিলা ঐক্যমতে পৌঁছাবে যে, এখন তারা মিলেমিশে বসবাস করতে পারছে না, তখন তারা এই অঙ্গীকারকে সন্তষ্টচিত্তে বাতিল করবে। যদি পুরুষ এমন ধ্যান-ধারণা রাখে অর্থাৎ পৃথক হতে চায় আর মহিলা যদি না চায় এবং পরস্পরের মাঝে যদি কোনভাবেই সমঝোতা না হয় তবে একটি পঞ্চায়েত তাদের মাঝে মীমাংসা করবে। সেই পঞ্চায়েতের দুজন সদস্য থাকবে, একজন পুরুষটির পক্ষের অপরজন মহিলাটির পক্ষের। যদি তারা এই সিদ্ধান্ত দেয় যে, পুরুষ ও মহিলাটির এখনও কিছুদিন একত্রে থাকা উচিত। তাহলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য সমীচীন হবে তাদের বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী চলা। কিন্তু এভাবেও সমঝোতা না হলে পুরুষটি মহিলাটিকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না এমনকি মোহরানাও পরিপূর্ণ আদায় করতে হবে। এর বিপরীতে যদি মহিলাটি পুরুষটি থেকে পৃথক হতে চায় তবে সে কাজী বা বিচারকের কাছে আবেদন করবে। কাজী যদি দেখেন এর পিছনে কোন দুরভিসন্ধি নেই, তবে তিনি তাকে বিচ্ছেদের অনুমতি দিবেন। আর এই ক্ষেত্রে মহিলাটির উচিত হবে তার স্বামীর ধন-সম্পদ বা মোহরানা যা তার কাছে গচ্ছিত আছে তা ফিরিয়ে দেওয়া। এছাড়াও যদি মহিলাটির স্বামী তার নির্ধারিত অধিকার প্রদান না করে বা তার সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয় বা তার বিছানা পৃথক করে দেয় তবে এর সময় নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। আর যদি সে অর্থাৎ স্বামী চার মাস বা এর অধিক এই কর্মকাণ্ড জারি রাখে তবে তাকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বা তালাক দিতে বাধ্য করতে হবে। আর যদি স্বামী মহিলার ভরণ পোষণ দেওয়া বন্ধ করে দেয় অথবা তাকে ছেড়ে কোথাও চলে যায় আর তার কোন খবরা-খবর না রাখে তবে তাদের বিবাহ ফাসেখ বা বাতিল আখ্যায়িত হবে (ইসলামী ফিকাহবিদগণ তিন বছর সময় নির্ধারণ করেছেন) এবং মহিলাটি পুনরায় বিবাহের অনুমতি দিয়ে মুক্ত ঘোষণা করা হবে। আর স্বামীকে নিজ স্ত্রী-সন্তানের খরচ নির্বাহের দায়ভার অর্পণ করা হবে। নিজ স্ত্রীকে সঙ্গত ভর্ৎসনা করার অধিকার স্বামীর আছে। তবে ভর্ৎসনা যখন শাস্তির রূপ লাভ করবে তখন লোকদের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা আবশ্যক। সাক্ষীদের সামনে অপরাধ প্রকাশ করবে এবং সাক্ষ্য প্রদান এর ভিত্তি হবে। আবার শাস্তি যেন এমন না হয় যে, দীর্ঘদিন এর প্রভাব বজায় থাকবে। স্বামী তার স্ত্রীর মালিক নয়। সে তাকে বিক্রি করতে পারবে না, চাকরানীর মত রাখতে পারবে না, তার স্ত্রী তার আহারাদির ভাগীদার, স্ত্রীর সাথে স্বামীর তার সামর্থ্য অনুযায়ী আচরণ করবে আর স্বামী যে শ্রেণীর তার থেকে নিম্ন শ্রেণীর আচরণ করা বৈধ হবে না। স্বামীর মৃত্যুর পর তার আত্মীয়-স্বজন স্ত্রীর উপর কোনরূপ অধিকার খাটাতে পারবে না। সে স্বাধীন, ভালমন্দ বিচার করে নিজে বিয়ে করতে পারবে এতে বাধা দেওয়ার অধিকার কারও নেই। তাকে নির্দিষ্ট স্থানেও থাকতে বাধ্য করা যাবে না। কেবল চার মাস দশ দিন পর্যন্ত তাকে স্বামীর ঘরে অবশ্যই থাকতে হবে যেন এই সময়ের মধ্যে সেসব পরিস্থিতি প্রকাশ পেয়ে যায়, যা তার ও তার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের অধিকারের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। স্বামীর মৃতুর পর স্ত্রীকে বছরব্যাপী ঘর থেকে বের করে দেওয়া যাবে না যদি না সে স্বেচ্ছায় যায়। এই সময়ে মধ্যে যেন সে নিজের প্রচেষ্টায় নিজ আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারে। স্বামী যদি স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয় তবে স্বামী নিজ ঘর থেকে পৃথক হয়ে যাবে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া যাবে না কেননা ঘর মহিলাদের অধিভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষায় মাও অংশ নিবে এবং তার মতামত গৃহিত হবে। সন্তান সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। স্তন্যপান করারো, সন্তানের দেখাশোনা করা প্রভৃতি বিষয়াদিতে তার মতামত গ্রহণ করা উচিত। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মাঝে বনিবনা না হলে যদি তারা পৃথক হতে চায় তবে শিশু সন্তান মায়ের সাথে থাকবে। তবে হ্যাঁ, সন্তান বড় হলে শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির জন্য পিতার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত সন্তান মায়ের কাছে থাকবে তার খরচ পিতা বহন করবে। এমনকি মা তার সন্তানের পিছনে যে সময় ব্যয় করছে আর যে কাজ করছে তারও আর্থিক প্রয়োজনাদি স্বামীর মেটানো উচিত।

নারী স্বতন্ত্র পদমর্যাদা রাখে আর তারা সকল প্রকারের ধর্মীয় পুরস্কার লাভে সক্ষম। মৃতুর পর তারা সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করবে এবং এই দুনিয়াতেও রাজত্বের বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আর এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান অধিকার লাভ করবে।

এই হলো সেই শিক্ষা যা রসুল করীম (সা.) সে সময়ে দিয়েছিলেন যখন দুনিয়াতে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধ্যান-ধারণা প্রচলিত ছিল। তিনি (সা.) এ সকল আদেশ প্রদান করে মহিলাদের সেই দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন যার শৃঙ্খলে তারা হাজার বছর ধরে আবদ্ধ ছিল। প্রতিটি দেশে এই দাসত্বকে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। সকল ধর্ম নারীর কাঁধে দাসত্বের জোয়াল রেখেছিল। একজন ব্যক্তি হাজার বছরের এই দাসত্বের শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে দেন আর দুনিয়ার সকল নারীকে মুক্তির স্বাদ দেন। মাতাদেরকে মুক্ত করে সন্তানদেরও দাসত্বের মনমানসিকতা থেকে মুক্ত করেন আর উঁচু ধ্যান-ধারণা ও বৃহৎ আকাঙ্খার স্পৃহা বৃদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু দুনিয়া এই সেবার কদর করে নি। যে বিষয়গুলি তাদের জন্য অনুগ্রহ ছিল তা যুলুম-অত্যাচর হিসেবে আখ্যায়িত করে। তালাক ও খোলাকে তারা ফিতনা ফাসাদ আখ্যা দেয়, সম্পদের উত্তরাধিকার হওয়াকে বংশীয় মূল্যাবোধের বিনাশ, মহিলাদের স্বতন্ত্র অধিকারকে পারিবারিক পরিবেশের বিনষ্টের কারণ বলে আখ্যায়িত করে। আর তারা যুগ যুগ ধরে এমনটি করেই চলল। তের শত বছর পর্যন্ত তারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এই দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তির কথা নিয়ে হাসি-তামাশা করে আর তাঁর শিক্ষাকে স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ বলে তুলে ধরে। অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসল যখন খোদার কালামের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হওয়া এবং যারা সভ্য ও সুশীল হওয়ার দাবি করত তারা রসুল করীম (সা.)-এর সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করার আদেশাবলীর অনুসরণ করবে। তাদের সকল রাষ্ট্র এক এক করে নিজ আইন-কানুন পরিবর্তন করে রসূল করীম (সা.) বর্ণিত রীতি-নীতির অনুসরণ করে।

ইংরেজি আইনে তালাক ও খোলা নেওয়ার ক্ষেত্রে যে কোন একটি পক্ষের ব্যভিচার সেই সাথে অত্যাচার ও মারপিট প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক ছিল। সেই আইন ১৯২৩ সালে পরিবর্তন করে তালাক ও খোলার জন্য কেবল ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়া যথেষ্ট বলে স্বীকার করা হয়।

নিউজিল্যাণ্ডে ১৯১২ সালে এই আইন জারি করা হয় যে, স্ত্রী সাত বছর যাবৎ মানসিক ভারসাম্যহীন থাকলে বিয়ে ফাসেখ বা বাতিল করা যেতে পারে। ১৯২৫ সালে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, স্বামী বা স্ত্রী যদি নর-নারীর অধিকার আদায় না করে তবে তালাক বা খোলা নেওয়া যেতে

শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়....

আবেগ ও উদ্দীপনা সাময়িক ও অস্থায়ী হওয়া উচিত নয়, বরং একজন মোমেনের কাজ হল, পুণ্যকর্মকে স্থায়িত্ব দেওয়া, পুণ্যকর্মে প্রতিযোগীতা করা এবং কর্মগত সংশোধনের জন্য সত সচেষ্ট থাকা।

কয়েক বছর পূর্বে 'কর্মের সংশোধন' নামে আমার ধারাবাহিক জুমার খুতবা নিশ্চয় শুনেছেন। সেগুলিতে অনেকগুলি সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে।

স্মরণ রাখবেন কর্মগত সংশোধনের মাধ্যমে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ, অর্থের মোহ, টিভি এবং অন্যান্য মাধ্যমে অশ্লীল অনুষ্ঠান দেখা, পরস্পরের মধ্যে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের অভাব ইত্যাদি সমস্যার অবসান ঘটবে।

২০১৮ সালের ১২, ১৩ ও ১৪ অক্টোবর তারিখে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার বাৎসরিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারতের প্রিয় সদস্যবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ ওয়া বরকাতুহু

একথা জেনে আমি বড়ই আনন্দিত হলাম যে, আপনারা বাৎসরিক ইজতেমা আয়োজন করার তৌফিক পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা এর আয়োজনকে সার্বিকভাবে আশিসমণ্ডিত করুন এবং এর শুভ পরিণাম প্রকাশ করুন। আমীন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিশ্বব্যাপি জামাতগুলি ধর্মীয় তরবীয়ত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জলসা এবং ইজতেমার আয়োজন করে থাকে। এই উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর দরস এবং বক্তব্য দান করা হয় যেগুলির দ্বারা ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। খিলাফতের বরকতের আালোচনা হয় যার দ্বারা যুগ খলীফার প্রতি জামাতের সদস্যদের ভক্তি ও অনুরাগের আবেগ আরও বিকশিত হয়। তারা জামাতের ব্যবস্থাপনা আরও ভালভাবে বোঝার এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। সজাগ ও সতর্ক খিদমতকারীদের দেখে ধর্মসেবার স্পৃহা জাগ্রত হয়। অতএব এমন আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিশেষ বরকত সম্পৃক্ত থাকে। আল্লাহ্ তা'লা ধর্মীয় বৈঠক পছন্দ করেন। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার কয়েকজন সম্মানীয় ফেরেশতা বিচরণশীল থাকেন আর তাঁরা (আল্লাহ্র) যিকরের মজলিস সন্ধান করে বেড়ান। তাঁরা এমন কোন বৈঠক পেলেই বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখনা দিয়ে সেই বৈঠককে ঢেকে নেন যেখানে আল্লাহ্র যিকর হয়। আর সমগ্র পরিমণ্ডল তাদের ছায়ার কল্যাণে সুরভিত হয়ে ওঠে।

আপনাদের ইজতেমাও বিশুদ্ধভাবে এক ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। এতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আপনাদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক জাগরণ সৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনাদের এই আবেগ ও উদ্দীপনা সাময়িক ও অস্থায়ী হওয়া উচিত নয়, বরং একজন মোমেনের কাজ হল, পুণ্যকর্মকে স্থায়িত্ব দেওয়া, পুণ্যকর্মে প্রতিযোগীতা করা এবং কর্মগত সংশোধনের জন্য সত সচেষ্ট থাকা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" যে ব্যক্তি সংস্কারক হতে চায় তার উচিত প্রথমে নিজেকে আলোকিত করা এবং নিজের সংশোধন করা। দেখ, এই যে সূর্য আলোকিত রয়েছে, প্রথমে সে নিজে আলো গ্রহণ করেছে। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, প্রত্যেক জাতির শিক্ষক এই শিক্ষাই দিয়েছেন। কিন্তু এখন অপরের উপর বেত্রাঘাত করা সহজ কাজ, কিন্তু আত্মোৎসর্গ করা দূরূহ বিষয় হয়ে পড়েছে। অতএব যে জাতির সংশোধন ও মঙ্গল কামনা করে সে নিজের সংশোধনের মাধ্যমে এই কাজ শুরু করুক। প্রাচীন যুগে ঋষি মুনিরা বন-জঙ্গলে গিয়ে নিজেদের সংশোধন কেন করতেন? তারা এই যুগের লেকচারারদের মত মুখ খুলতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেরা আমল করতেন। এটিই খোদা তা'লার নৈকট্য ও ভালবাসার পথ। যে ব্যক্তি মনে কিছু রাখে না তার বর্ণনা নালার পানির মত যা বিবাদের জন্ম দেয়। আর যে মারেফাতের জ্যোতিঃ এবং আমল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে কথা বলে সে সেই বৃষ্টির ন্যায় যাকে করুণা ধারা মনে করা হয়।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬২)

স্মরণ রাখবেন, আপনারা মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য যা আহমদী যুবকদের সংগঠন। এর সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মুওউদ (রা.) এর এই উপদেশ বার বার শুনেছেন-

'জাতির সংশোধন যুবকদের সংশোধন ব্যাতিরেকে সম্ভব নয়'

এই উপদেশকে বাস্তবায়িত করা আবশ্যক। সর্বদা নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতার বিষয়ে সজাগ থাকুন। এর কারণ অনুসন্ধান করুন। সেই সমস্ত মাধ্যম দ্বারা সতর্কতা অবলম্বন করুন যেগুলির দ্বারা এই ত্রুটি দূর হতে পারে। কয়েক বছর পূর্বে 'কর্মের সংশোধন' নামে আমার ধারাবাহিক জুমার খুতবা নিশ্চয় শুনেছেন। সেগুলিতে অনেকগুলি সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছিল যে, যুগের নিত্যনতুন আবিষ্কার ও সুযোগ সুবিধা থেকে উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ নয়। নির্লজ্জতা, ধর্ম বিচ্যুতি এবং অবিশ্বাসের প্রভাবাধীন হয়ে নিজেদেরকে শত্রুদের হাতে সমর্পন করার পরিবর্তে এগুলির মাধ্যমে আপনাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হতে হবে। স্মরণ রাখবেন কর্মগত সংশোধনের মাধ্যমে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ, অর্থের মোহ, টিভি এবং অন্যান্য মাধ্যমে অশ্লীল অনুষ্ঠান দেখা, পরস্পরের মধ্যে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের অভাব ইত্যাদি সমস্যার অবসান ঘটবে। আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে চোর, ডাকাত, দুরাচারী, ব্যাভিচারী, জুয়ারী, মদ্যপ ইত্যাদি বিভিন্ন পাপে নিমজ্জিত ছিল। প্রকৃত ঈমান তাদের মধ্যে ইচ্ছা শক্তি সৃষ্টি করে। তারা সংকল্প করে নেন যে, এখন খোদা তা'লার আদেশের বিরুদ্ধে আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না। তারা নিজেদের কর্মের দূর্বলতা এমনভাবে দূরে নিক্ষেপ করে দেন যেভাবে এক দুর্বার গতির প্লাবনের স্রোত একটি তৃণখণ্ডকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কর্মগত সংশোধন শিরোণামে এই খুতবাগুলি পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি অধ্যয়ন করুন যাতে সমস্ত বিষয় মাথার মধ্যে নতুন করে গেঁথে যায় এবং সেগুলির উপর সাহাবাদের ন্যায় ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আমল করতে পারেন।

সৈয়্যদানা হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) -এর শিক্ষামালা থেকে জানা যায় যে, জাগতিক ধন-সম্পদ কোন মূল্যই রাখে না। খোদা তা'লার কাছে তাঁর সন্তুষ্টি, কৃপা এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া প্রার্থনা করতে থাকা উচিত। তিনি (আ.) বলেন:

" সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সে নয় যে জাগতিক ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয় আর সেই সম্পদ দিয়ে হাজার হাজার বিপদাপদ ভোগের কারণ হয়, বরং সৌভাগ্যবান সেই যে ঈমানের সম্পদ প্রাপ্ত হয় এবং খোদা তা'লার অসন্তুষ্টি এবং প্রকোপকে ভয় করে এবং সর্বদা নিজেকে প্রবৃত্তির উত্তেজনা এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে থাকে, কেননা, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি সে এভাবে অর্জন করবে, কিন্তু স্মরণ রেখো, এবিষয়টি এমন অনায়াসে অর্জিত হতে পারে না। তাই তোমাদের জন্য আবশ্যক হল নামাযে দোয়া করা যাতে খোদা তা'লা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং তোমাদেরকে পাপ এবং অপবিত্র জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তি ও সামর্থ্য দান করেন। ..... যারা পাপ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নয় এবং খোদা তা'লাকে ভয় করে না তারা পবিত্র হতে পারে না। "

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৬০৮)

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এই সমস্ত বিষয়ের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 29 Nov, 2018 Issue No.48

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১০ পাতার পর.....

পারে এবং তিন বছর যাবৎ খোঁজ খবর না নিলে তালাক বৈধ বলে আখ্যা দেওয়া হয় (হুবুহ ইসলামী ফিকাহবিদগণের অনুকরণ করেছে তবে তের শত বছর ইসলামের উপর আপত্তি করার পর)।

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রাজ্যে আইন করা হয়, পাঁচ বছর মানসিক ভারসাম্যহীন থাকলে তালাক নেওয়া যাবে। তাসমানীয়াতে ১৯১৯ সালে আইন পাশ করা হয় ব্যভিচার, চার বছর পর্যন্ত খোঁজ-খবর না নেওয়া, মাতলামো এবং তিন বছর পর্যন্ত সম্পর্কহীনতা, বন্দীত্ব, মারপিট এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতা এসব তালাকের শর্ত। ভিক্টোরিয়া রাজ্যে ১৯২৩ সালে আইন পাশ করা হয় যে, স্বামী যদি তিন বছর পর্যন্ত কোন যোগাযোগ না রাখে, ব্যভিচার করে, ব্যয়ভার বহন না করে, কঠোরতা করে, বন্দী থাকে, মারপিট করে বা মহিলারা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, মানসিক ভারসাম্যহীন, কঠোরতা এবং ফিৎনা -ফাসাদে লিপ্ত হয় তবে তালাক ও খোলা নেওয়া যেতে পারে।

পশ্চিয় অস্ট্রেলিয়ায় উপরে বর্ণিত আইনগুলি ছাড়াও গর্ভবতী মহিলার বিয়েকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (ইসলামও একে অবৈধ আখ্যা দিয়েছে)। কিউবা দ্বীপ ১৯১৮ সালে ব্যভিচারে বাধ্য করা, মারপিট, গালমন্দ করা, সাজা প্রাপ্ত হওয়া, মাতলামো করা, জুয়ার অভ্যাস, অধিকার প্রদান না করা, খরচ বহন না করা, চিররোগী অথবা পরস্পরের মধ্যে বনিবনা না হলে এগুলি তালাক বা খোলা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ বলে আইন পাশ করা হয়।

ইটালিতে ১৯১৯ সালে আইন করা হয়েছে যে, মহিলারা তাদের সম্পত্তির মালিক হবে এবং তা থেকে তারা সদকা-খয়রাত করতে পারবে, এমনকি বিক্রিও করতে পারবে (তখনও পর্যন্ত ইউরোপে মহিলাদেরকে তাদের সম্পত্তির মালিক মনে করা হত না)। মেক্সিকো ও আমেরিকাতেও উপরে উল্লেখিত কারণগুলোকে তালাক বা খোলা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ বলে স্বীকার করা হয় আর সেই সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়াকেও সেই কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই আইন ১৯১৭ সালে পাশ হয়েছে। পর্তুগালে ১৯১৫ সালে, নরওয়েতে ১৯০৯ সালে, সুইডেনে ১৯২০ সালে, সুইজারল্যাণ্ডে ১৯১২ সালে তালাক ও খোলার অনুমতি দিয়ে এমন আইন পাশ করা হয়েছে। সুইডেনে ১৮ বছর পর্যন্ত সন্তানের খরচ প্রদানে পিতাকে বাধ্য করা হয়। ইউনাইটেড স্টে অব আমেরিকাতে এখনও পর্যন্ত সন্তানের অধিকার পিতাকে দেওয়া হয় তবে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী আইন সংশোধন করা শুরু হয়ে গেছে। বিচারক মহিলাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখানো শুরু করেছে এবং পুরুষকে খরচাদি প্রদানে বাধ্য করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই আইনে অনেক ত্রুটি আছে, পুরুষদের অধিকার আদায়ে অনেক বেশি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। মহিলাদের তাদের সম্পত্তি খরচের অনুমতি দেওয়া হয় কিন্তু সেই সাথে কিছু কিছু রাজ্যে এই আইনও পাশ করা হয়েছে যে, স্বামী যদি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয় তবে তার খরচ নির্বাহ করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক।

মহিলাদের ভোট প্রদানের অধিকার প্রদান করা হচ্ছে। তাদের থেকে জাতীয় বিষয়াবলীতে পরামর্শ নেওয়ার পথ উন্মোচিত হচ্ছে। এ সমস্ত বিষয় রসুল করীম (সা.) -এর নিদের্শ প্রদানের সাড়ে তের শত বছর পরে ঘটছে এবং এখনও অনেক কিছু ঘটতে বাকি আছে। এমন বহু দেশ আছে যেখানে মহিলাদের পিতা-মাতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বলে মনে করা হয় না। এছাড়ও আরও অনেক এমন অধিকার আছে যেগুলির ক্ষেত্রে ইসলাম দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিচ্ছে কিন্তু তারা এই নেতৃত্বকে অস্বীকার করছে। তবে সেই দিন বেশী দূরে নয় যখন দুনিয়া এই বিষয়াদিতে রসুল করীম (সা.)-এর নেতৃত্বের অনুবর্তিতা করবে যেভাবে অন্য বিষয়াবলীতে অনুবর্তিতা করেছে। আর এভাবেই নারী জাতির মুক্তির জন্য রসুলে করীম (সা.)-এর লড়াই প্রভাব বিস্তার করবে এবং চূড়ান্ত ফল বয়ে আনবে।

(আল ফযল, ১২ ই জুন, ১৯২৮, আনওয়ারুল উলুম, ১০ম খন্ড, পৃ: ২৩১-২৪১)

(সৌজন্যে: নুরুদ্দীন পত্রিকা, ২০১৭)

১ম পাতার শেষাংশ.....

চাও তাহা হইলে এই পাঁচ বারের নামায পরিত্যাগ করিও না কারণ এগুলি তোমাদের অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ।

নামাযে ভারী বিপদেও প্রতিকার রহিয়াছে । তোমরা অবগত নহ যে, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কি (নিয়তি) আনয়ন করিবে । সুতরাং দিবসের উদয়নের পূর্বেই তোমরা তোমাদের মওলার সমীপে সবিনয় নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশিসপূর্ণ দিবস আগমন করে ।

হে আমীর-বাদশাহ্ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ! আপনাদের মধ্যে এরূপ লোক অল্পই যাহারা খোদাতা'লাকে ভয় করেন এবং তাঁহার পথে সততা ও সাধুতা অবলম্বন করিয়া চলেন । অধিকাংশই দুনিয়ার সম্পদ ও দুনিয়ার ঐশ্বর্যে মত্ত হইয়া আছে; তাহাতেই জীবন নিঃশেষ করিতেছে এবং মৃত্যুকে স্মরণ করিতেছে না । প্রত্যেক আমীর বা ধনী ব্যক্তি, যে নামায পড়ে না এবং খোদাতা'লার পরওয়া করে না, তাহার সমস্ত (বেনামাযী) ভৃত্য ও কর্মচারীর পাপ তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইবে । যে আমীর সুরা পান করে তাহার স্কন্ধে ঐ সকল লোকের পাপও ন্যস্ত হইবে, যাহারা তাহার অধীনে থাকিয়া সুরা পান করিয়া থাকে । হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! এই দুনিয়া চিরকাল থাকিবার জায়গা নহে । তোমরা সাবধান হও, সকল অনাচার পরিহার কর এবং সকল প্রকার মাদকদ্রব্য বর্জন কর । মানুষকে ধ্বংস করিবার জন্য শুধু সুরা পানই নহে, বরং আফিন, গাঁজা, চরস, ভাঙ, তাড়ি ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের মাদক দ্রব্য, যাহা সদা ব্যবহারের অভ্যাস করিয়া লওয়া হয়, মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এবং পরিণামে ধ্বংস করে । অতএব, তোমরা এইসব হইতে দূরে থাক । আমি বুঝিতে পারি না তোমরা কেন এই সকল জিনিষ ব্যবহার কর যাহার কুফলে প্রতিবৎসর তোমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র নেশায় অভ্যস্ত লোক এই দুনিয়া হইতে অহরহ চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে ।*

পরকালের আযাব তো পৃথক রহিয়াছে ।

টীকা: ইউরোপের লোকের মদ যত অনিষ্ট করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, ঈসা (আঃ) মদ্যপান করিয়াছেন, হয়তো কোন রোগবশতঃ বা প্রাচীন অভ্যাস অনুযায়ী তিনি এরূপ করিয়াছেন, হে মুসলমানগণ! তোমাদের নবী আলায়হেস সালাম তো প্রত্যেক প্রকারের মাদকদ্রব্য হইতে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিলেন, যেমন তিনি ছিলেন বস্তুতই নিষ্পাপ । অতএব তোমরা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহার অনুসরণ করিতেছ? কুরআন ইঞ্জিলের মত মদকে বৈধ সাব্যস্ত করে না । সুতরাং তোমরা কোন দলীলের সাহায্যে মদকে বৈধ সাব্যস্ত কর? তোমাদের কি মরিতে হইবে না?

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২২, পৃ: ৬৮-৭১)

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

'আমরা মুসলমান । এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ কলেমায় আমরা বিশ্বাসী । আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি । আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী । আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই । যা কিছু আল্লাহ্ ও রসুল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দিই । আমরা শরীয়তের কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না । যা কিছু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি- আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাই বা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি । আমরা আল্লাহ্র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান ।"

(নুরুল হক, খণ্ড-১ , পৃ: ৫)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir